পূর্ববাংলার রাজনীতি ও মুসলিম লীগ (১৯০৬-১৯৪৭)

Politics of East Bengal and Muslim League (1906-1947)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মে - ২০১৯

গবেষক

নাজমুন নাহার

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৯৯
সেশন: ২০১৩-২০১৪

তত্ত্বাবধায়ক

মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস

অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮ ০২-৯৬৬১৯২০২-৭৩

Md. Ataur Rahman Biswas
Professor
Department of Islamic History and Culture
University of Dhaka
Dhaka – 1000
Phone +88 02-96619202-73

Ref…….. Date: ……

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এম.ফিল. গবেষক নাজমুন নাহার কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত "পূর্ববাংলার রাজনীতি ও মুসলিম লীগ (১৯০৬-১৯৪৭)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি একটি গবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এই শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ লেখা হয়নি। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি মনোযোগ সহকারে পড়েছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রি প্রদানের জন্য বিবেচনাযোগ্য বলে মনে করছি।

মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণা পত্র

আমি নাজমুন নাহার এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "পূর্ববাংলার রাজনীতি ও মুসলিম লীগ (১৯০৬-১৯৪৭)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব এবং একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ গবেষণাকর্মের পূর্ণ কিংবা অংশবিশেষ অন্য কোথাও প্রকাশ করিনি।

নাজমুন নাহার

এম.ফিল. গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: ৯৯
সেশন: ২০১৩-২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"পূর্ববাংলার রাজনীতি ও মুসলিম লীগ (১৯০৬-১৯৪৭)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস। তাঁর তত্ত্বাবধানে এ অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে। বিশাল হৃদয়ের এই পণ্ডিত শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়কই নন, তিনি আমার গবেষণা কর্মের প্রেরণার উৎস এবং অভিভাবকও বটে। মূলত তাঁরই প্রেরণায় আমার মতো একজন নগন্য ছাত্রী গবেষণা কর্মের মত একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর প্রজ্ঞা ও বস্তুনিষ্ঠ উদার দৃষ্টিভঙ্গি আমার চিন্তা শক্তিকে পরিশীলিত করেছে। গবেষণা কর্মটি করতে গিয়ে অনেক সময় এ কাজটিকে কঠিন মনে হয়েছে। কখনো কখনো হতাশ হয়ে পড়েছি। সে সময় তাঁর সরল আলোচনা ও নির্দেশনা আমার বহু অস্বচ্ছ ধারণাকে স্বচ্ছ ও কাজে গতিশীলতা আনয়ন করতে সাহায্য করেছে। তিনি এ অভিসন্দর্ভের শিরোনাম, অধ্যায় বিন্যাস সহ যাবতীয় কাজের তত্ত্বাবধান করে আমার কাজটিকে সহজ করে দিয়েছেন। সকল কাজের মাঝেও তিনি যে যত্নসহকারে আমাকে সময় দিয়েছেন তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। অভিসন্দর্ভটির সার্বিক পরিকল্পনা ও অধ্যায় বিন্যাসসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটিকে প্রাসঙ্গিক করে উপস্থাপনে সহায়তা করেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আতাউর রহমান মিয়াজী ,অধ্যাপক ডঃ এ. কে. এম. গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক ডঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান খান, এবং সহযোগী অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ। তাঁরা প্রথম থেকেই এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে আমাকে নানাভাবে পরামর্শ ও সহায়তা করেন। এ জন্য তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। শিক্ষকগণের পাশাপাশি এ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ, যারা বিভিন্ন সময়ে আমার দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন।

এছাড়া আমার পরিবারের সকলে যেভাবে আমাকে গবেষণাকর্ম চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে তা কৃতজ্ঞতার উর্ধ্বে। তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিশেষে সুস্থ শরীরে এ গবেষণাকর্ম শেষ করতে পারায় পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

গবেষক

নাজমুন নাহার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা **১**

প্রথম অধ্যায়: পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা (প্রাচীনকাল থেকে ১৯০৬) **৯**

১.১ বাংলা নামের উদ্ভব ৯

১.২ বাংলা প্রদেশের উদ্ভব ও বিকাশ ১২

১.৩ বাংলায় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা ২০

১.৪ পূর্ববাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ২৪

১.৫ মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা ৩৪

১.৬ বঙ্গভঙ্গ ও মুসলিম লীগ গঠনের প্রেক্ষাপট ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়: সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা এবং এর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও নীতি নির্ধারণ (১৯০৬-১৯১২) **৫২**

২.১ সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ৫২

২.২ মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও কর্মপন্থা ৬৯

২.৩ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ (BPML) এর আত্মপ্রকাশ ৭৩

২.৪ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রম ৭৬

তৃতীয় অধ্যায়: পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম (১৯১২-১৯৩৫) **৯২**

৩.১ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মপন্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ৯২

৩.২ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগের ভূমিকা ৯৯

৩.৩ ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও মুসলিম লীগের কার্যক্রম ১১০

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাংলার রাজনীতিতে কৃষক প্রজা পার্টির ভূমিকা ও মুসলিম লীগের পুনর্জাগরণ (১৯৩৫-১৯৪০) **১২৪**

৪.১ বাংলার রাজনীতিতে এ.কে.ফজলুল হক ও কৃষক প্রজা পার্টির উত্থান ১২৪

৪.২ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও মুসলিম লীগের পুনর্গঠন ১৩০

৪.৩ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ও মুসলিম লীগের ভূমিকা ১৪৩

৪.৪ কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের পরিবর্তনশীল নীতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের কার্যক্রম ১৪৬

পঞ্চম অধ্যায়ঃ বঙ্গীয় মন্ত্রিসভার কার্যক্রম ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য মুসলিম লীগের সংগ্রাম (১৯৪০-১৯৪৭) **১৬২**

৫.১ বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা গঠন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের কার্যক্রম ১৬৩

৫.২ ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের অবস্থান ১৭০

৫.৩ মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম ও মুসলিম লীগের কার্যক্রম ১৭৮

৫.৪ স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, বাংলা বিভক্তি ও মুসলিম লীগের ভূমিকা ১৯০

উপসংহার **২১৫**

পরিশিষ্ট **২২৪**

গ্রন্থপঞ্জী **২৩৮**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে সাড়ে পাঁচশত বছর এদেশে মুসলিম শাসনব্যবস্থা কায়েম ছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসনাধীনে বাংলার মুসলমান সমাজ নানাবিধ বঞ্চনার স্বীকার হয়। সকলক্ষেত্রে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি হলে তাঁরা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯০৬ সালে পূর্ববাংলার মাটিতে জন্ম লাভ করে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন 'মুসলিম লীগ'। মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে এবং দলটির আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান নামে নতুন এক মুসলিম রাষ্ট্র এবং পূর্ববাংলা নতুন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯০৬-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে পূর্ববাংলার রাজনীতি ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ এ অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

১৮৮৫ সালে ভারতবাসীর জাতীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন কারণে এ প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে থাকে। এরপর ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার 'বঙ্গভঙ্গ' এর মাধ্যমে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে নতুন প্রদেশ গঠন করলে বাংলার মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে সচেষ্ট হন। এ সময় পূর্ব বাংলায় নবাব স্যার সলীমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' (All India Muslim League) নামে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৬-১৯১২ সাল পর্যন্ত সময়কে মূলত মুসলিম লীগের গঠনতান্ত্রিক উন্নতির স্তর হিসেবে বিবেচনা করা যায়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

অবিরাম আপোষহীন পথ চলা শুরু হয়। ১৯১২ সালের মধ্যে একদিকে যেমন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' (BPML) সহ মুসলিম লীগের কয়েকটি শাখা স্থাপিত হয়, অন্যদিকে এর গঠনতন্ত্র ও কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়। এসময় থেকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মপন্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টাও শুরু হয়।

বাংলার রাজনীতিতে ১৯১২-১৯৩৫ সালের ঘটনাবলী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা বিংশ শতাব্দীর এ পর্যায়ে ভারতের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সংঘটিত কিছু ঘটনা বাংলা সহ ভারতের মুসলমানদের চেতনাকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে। ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের সরকারী ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমানদের অনুভূতিতে প্রথম আঘাত লাগে এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। এসময় পূর্ববাংলার রাজনীতি ও মুসলিম লীগ ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠে। ১৯১৩ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগদান করার পর তাঁর উদ্যোগে অচিরেই ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও কংগ্রেস-লীগ সমঝোতা সৃষ্টি হয় এবং ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যুক্ত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিয়ে 'লক্ষ্মৌ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মাধ্যমেই মুসলিম লীগ প্রথম ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এরপর ১৯১৯ সালে প্রণীত 'শাসন সংস্কার আইন', ১৯১৯-১৯২২ সাল পর্যন্ত পরিচালিত 'খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন', ১৯২৩ সালে স্বাক্ষরিত 'বেঙ্গল প্যাক্ট' প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মুসলিম লীগ অনন্য ভূমিকা পালন করে। এ সময় স্বায়ত্তশাসন ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অভীষ্ট লক্ষ্য। তাই উভয় দল যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করতে থাকে। ১৯২৭ সালের 'দিল্লি প্রস্তাব', ১৯২৮ সালের 'নেহেরু কমিটি', ১৯২৯ সালের 'চৌদ্দ দফা' ছিল শাসনতান্ত্রিক সমস্যা নিরসনের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা।

এসময় ব্রিটিশ সরকারও ভারতের শাসন সংস্কারের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত 'সাইমন কমিশন' শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে যে সুপারিশ করে; তা ভারতের কোন রাজনৈতিক দলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি ১৯৩০-১৯৩২ সালের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

লন্ডনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের নিয়ে পরপর তিনটি 'গোলটেবিল বৈঠক' এর আয়োজন করলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৩৫ সালে 'ভারত শাসন আইন' এ ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন না হলে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলই এ আইন প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৩৫-১৯৪০ সালের মধ্যে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে কিছু যুগান্তকারী ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। এসময় বাংলার রাজনীতিতে নতুন দল কৃষক-প্রজা পার্টি এবং এ.কে. ফজলুল হকের উত্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই অংশগ্রহন করে। নির্বাচনে মুসলিম লীগ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে এবং এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রথম 'প্রজা-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা' গঠিত হয়। এসময় পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আদর্শ ও মূলনীতি এক ও অভিন্ন ছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবিতে এ.কে. ফজলুল হক কর্তৃক ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপনের পর থেকে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারায় ও নীতি-নির্ধারণে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাবে পরিণত হয় এবং মুহম্মদ আলী জিন্নাহর 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে ।

১৯৪০-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কে বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে আলোড়িত ও গতি পরিবর্তনকারী রাজনীতির আবর্তনের সময় বলা যায়। এসময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে বারবার মন্ত্রিসভার ছন্দপতন ঘটে, ফলে বাংলার রাজনীতির গতিধারা দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে মুসলিম লীগ নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে এবং পূর্ববাংলায় এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দীর দক্ষতায় অদ্বিতীয় ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এসময় মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির দাবিতে মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান আন্দোলন'-এ সোচ্চার হয়। সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কাছে শাসন ক্ষমতা

Dhaka University Institutional Repository

হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষনা করে। যেহেতু কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকার অখন্ড ভারতের পক্ষে ছিল তাই এপর্যায়ে মুসলিম লীগকে দুই বিরুদ্ধ শক্তির সাথে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। যদিও ব্রিটিশ সরকার শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা করে কিন্তু এসকল পরিকল্পনা কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আরো জোরদার হয়।

অন্যদিকে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা ভারত বিভাগের সাথে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবি তুলে ধরেন। যদিও শরৎচন্দ্র বসু ও এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী সহ কয়েজন নেতা একাত্ম হয়ে বাংলাকে বিভক্ত না করে 'অখন্ড স্বাধীন বাংলা' রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করেন কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছার অভাবে শেষ পর্যন্ত অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ভারত স্বাধীনতা চূড়ান্ত হয় এবং মুসলিম লীগের দাবি অনুযায়ী ভারত বিভক্ত হয়ে 'পাকিস্তান' নামে নতুন মুসলিম রাষ্ট্রটির উত্থান ঘটে।

জন্মলগ্ন থেকে মুসলমানদের দাবি আদায়ের স্বার্থে মুসলিম লীগের উত্থান ও বিকাশ, কংগ্রেসের সাথে সমঝোতা স্থাপন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও পৃথক আবাসভূমির দাবিতে বলিষ্ঠ ও অনমনীয় অবস্থানের ফসল ১৯৪৭ সালের স্বাধীন পাকিস্তান। যেহেতু ১৯০৬ সালে পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমার সূত্রপাত ঘটে এবং এর ক্রমবিকাশে পূর্ববাংলার রাজনীতিকদের অবদান অপরিসীম; একারণে ১৯০৬-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে পূর্ববাংলার রাজনীতি ও মুসলিম লীগের কার্যক্রম বিশেষ পর্যালোচনা ও গবেষণার দাবি রাখে।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

আমার জানামতে, 'পূর্ববাংলার রাজনীতি ও মুসলিম লীগ (১৯০৬-১৯৪৭)' শিরোনামে এ পর্যন্ত কোন মৌলিক গবেষণা হয়নি। আলোচ্য সময়ে পূর্ববাংলার রাজনীতি ও মুসলিম লীগের সামগ্রিক কার্যক্রম নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তাই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলার রাজনীতি ও মুসলিম লীগের সামগ্রিক রাজনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন।

গবেষণা পদ্ধতিঃ

আধুনিক বিশ্বে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকৃতি অনুযায়ী গতানুগতিক এবং বাস্তবধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। একইভাবে এ গবেষণায়ও উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন-

(১): প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎসের সংকলন এবং উৎস থেকে পাওয়া বিভিন্ন উপাদানের সঠিক তথ্য উপস্থাপন।

(২): গতানুগতিক পদ্ধতি ছাড়াও গবেষণা কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আলোচনা সভা, সম্মেলন এবং ইতিহাস ভিত্তিক পত্রিকা থেকে পাওয়া তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও উপস্থাপন।

প্রাথমিক উৎসঃ

এ গবেষণায় প্রাথমিক উৎস থেকে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বাস্তবধর্মী পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যেমন ইতিহাসবিদ, পন্ডিত এবং বুদ্ধিজীবীদের মন্তব্য ও সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎসঃ

গবেষণাকর্মটি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় রচিত অনেক গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। ইংরেজি গ্রন্থের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics (Harun-or-Rashid), The History of Bengal (R.C. Majumdar), Muslim Community in Bengal (Sufia Ahmed) এবং বাংলা গ্রন্থের মধ্যে এম. এ. রহিম (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস), ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক), বাংলাদেশের ইতিহাস (ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন) প্রভৃতি বই থেকে অনেক তথ্য নিয়েছি। সেজন্য লেখকদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার সাময়িকী, গবেষণা প্রতিবেদন, গবেষণা প্রবন্ধ, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, প্রাসঙ্গিক রচনাবলী ইত্যাদি থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি।

গবেষণা পরিধিঃ

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম যদিও 'পূর্ববাংলার রাজনীতি ও মুসলিম লীগ (১৯০৬-১৯৪৭)' এবং এ গবেষণার পরিধি ১৯০৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ৪১ বছর, তথাপি এর আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন যুগ থেকে যখন বঙ্গ জনপদের উৎপত্তি হয়। এরপর যেভাবে পূর্ববাংলা প্রদেশ হিসেবে বিকাশ লাভ করে তার বর্ণনা, পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা, মুসলিম লীগ গঠন, এর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও কর্মপন্থা এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ ও কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববাংলায় এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগের সামগ্রিক রাজনৈতিক কার্যক্রম, মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির দাবিতে মুসলিম লীগের আপোষহীন সংগ্রামের নাতিদীর্ঘ বিবরণ ও সর্বোপরি ১৯৪৭ সালে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সফলতা অর্জনের ইতিহাস উপস্থাপন এবং সবশেষে উপসংহারের মাধ্যমে গবেষণাকর্মের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতাঃ

প্রত্যেক গবেষণাকর্মের ন্যায় আমার গবেষণাকর্মেরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে সংশ্লিষ্ট সকল গ্রন্থ আমি আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হইনি। তাছাড়া তথ্য উপাত্তসমূহ সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমার পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যম ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট সকল দলিল দস্তাবেজ অধ্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। এসকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গবেষণাকর্মটিকে বস্তুনিষ্ঠ করা এবং গঠনমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

অধ্যায় বিন্যাসঃ

পূর্ববাংলা ও মুসলিম লীগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা, এর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও কর্মপন্থা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ ও কার্যক্রম, পূর্ববাংলায় এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগের সামগ্রিক রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির দাবিতে মুসলিম লীগের সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়ের আলোকে গবেষণাকর্মটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। **প্রথম অধ্যায়ে** যে সকল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলায় মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংগঠন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় সে সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯০৬-১৯১২** সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র, এ সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়ে ১৯১২-১৯৩৫** সালের মধ্যে সংগঠিত ঘটনাবলী যেমন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মপন্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগের ভূমিকা, ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও মুসলিম লীগের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। **চতুর্থ অধ্যায়ে ১৯৩৫-১৯৪০** সালের মধ্যে পূর্ববাংলার রাজনীতির কিছু যুগান্তকারী ঘটনা যেমন কৃষক-প্রজা পার্টি ও এ.কে. ফজলুল হকের উত্থান, **১৯৩৭** সালের নির্বাচন ও মুসলিম লীগের পুনর্জাগরণ এবং **১৯৪০** সালের লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। **পঞ্চম অধ্যায়ে**

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪০-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার রাজনীতি আবর্তনের ঘটনাসমূহ অর্থাৎ বঙ্গীয় মন্ত্রিসভার কার্যক্রম ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের অবস্থান, ১৯৪৬ সালের নির্বাচন, মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য মুসলিম লীগের সংগ্রাম, 'অখন্ড স্বাধীন বাংলা' রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ও বাংলা বিভক্তিতে মুসলিম লীগের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। **উপসংহারে** ১৯০৬-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই সামগ্রিক ঘটনাপঞ্জীর সার্বিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আর পরিশিষ্টে মুসলিম লীগের সাথে সংশ্লিষ্ট ও বিখ্যাত রাজনীতিবিদদের জীবনপঞ্জী সহ কিছু তথ্য ও চিত্র সংযোজন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা (প্রাচীনকাল থেকে ১৯০৬)

১.১ বাংলা নামের উদ্ভব

বাংলাদেশ নামক শব্দটি এক ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফল। বিশ্ব মানচিত্রে ১৯৭১ সালে জায়গা করে নেয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি ১৯৪৭ এর মধ্য আগষ্ট পর্যন্ত ছিল বৃহত্তম বঙ্গদেশ এর অংশ যাকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা বলত 'Bengal'। তাদের আগে পর্তুগীজরা বঙ্গদেশকে বলত 'Bengala' যা তারা নিয়েছিল মুঘল সম্রাটদের ব্যবহৃত বঙ্গাল নামকরণ থেকে। সম্রাট আকবর যখন ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা জয় করেন তখন থেকে 'বঙ্গাল' নামকরণ আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আর মুঘলরা বঙ্গাল নামটি নিয়েছিল পূর্ববর্তী সুলতানদের 'বাঙ্গালাহ' নাম ব্যবহারের ধারাবাহিকতা থেকে।[১]

'বঙ্গাল' নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল (আইন-ই-আকবরী) এভাবে যে, মুঘলদের এ সুবাহ(প্রদেশ) এর প্রাচীন নাম ছিল বঙ (বঙ্গ) এবং পূর্বেকার শাসকগন পাশে/প্রস্থে বিশ গজ ও উচ্চতায় দশ গজ উঁচু বাঁধ বা 'আল' নির্মান করতেন। 'বঙ্গ' এর সাথে 'আল' যুক্ত হয়ে দেশটির নাম হয় বঙ্গাল। এর ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু এটা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, আবুল ফজল বুঝাতে চেয়েছেন যে, বঙ্গাল নামকরণটির উৎপত্তি হয়েছে সুলতানি যুগের 'বঙ্গ' অর্থাৎ প্রাক মুসলিম যুগের 'বঙ্গ' থেকে।[২]

Dhaka University Institutional Repository

'বঙ্গ' ছিল মূলত প্রাচীনকালের অর্থাৎ হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসকদের সময়কালে এবং তারও আগে 'বঙ্গদেশ' এর অনেক জনপদের একটি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ভৌগোলিক বিভাগ হিসেবে 'বঙ্গ' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ন ও মহাভারতেও 'বঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে,তবে ঋকবেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে প্রথম 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আধুনিক পন্ডিতেরা মনে করেন যে, পুন্ড্র, রাঢ়, গৌড় ও বঙ্গ ইত্যাদি প্রতিবেশী জনপদের অধিবাসীরা স্বাভাবিক বিরোধ-সংঘাত ও মিলন-বিরোধের মাধ্যমে পরস্পরের কাছাকাছি আসে এবং খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যে এভাবে সমন্বয় প্রক্রিয়ার দ্বারা বাঙালি বলে একটি বিশিষ্ট জাতির সৃষ্টি হয়। কোন কোন পন্ডিত গবেষকের ধারণা যে, বাঙালি জাতি থেকে 'বাঙালা' বা 'বাংলা' নামের উৎপত্তি হয়েছে।[৩] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে 'বঙ্গাল' শব্দের সাথে ফার্সি প্রত্যয় 'অহ' বা 'আ' যোগ করলে 'বাঙালাহ' বা 'বাঙ্গালা' নামক দেশের ফার্সি নাম পাওয়া যায়। এই ফার্সি 'বাঙ্গালাহ' বা 'বাঙ্গালা' থেকেই মধ্য যুগের 'বাঙ্গালা' এবং আধুনিক 'বাংলা' নামের উৎপত্তি।[৪]

বাংলা নামের বিবর্তনে 'ইলিয়াস শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-১৩৫৮) একটি বড় ভূমিকা ছিল। তিনি সর্বপ্রথম বঙ্গ দেশকে একক শাসনের অধীনে এনে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' উপাধি লাভ করেছিলেন। হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সালতানাত প্রায় দুইশত বছর টিকেছিল। এ সময়ে 'বাঙ্গালাহ্' নামের ব্যাপক পরিচিতি ঘটে। তারও আগে, তেরো শতকে দু'জন বিদেশি পর্যটক মার্কোপোলো ও রশিদুদ্দিন 'বাঙ্গালাহ্' নামটি ব্যবহার করেছেন তাদের ভ্রমন কাহিনীতে। ১৪৯৪-১৫৩৮ সময়কালে হোসেন শাহী শাসনামলে বাঙ্গালা রাজ্যটির আয়তন বৃদ্ধি পায়। সুলতান নাসিরুদ্দিন নুসরাত শাহ্ এর সময় ১৫২১ সালে পর্তুগীজরা বাংলায় আসেন। পর্তুগীজরা বাংলা জনপদকে 'বেঙ্গালা' বলতেন। পরবর্তী ষোল ও সতের শতকে ইউরোপীয়দের লেখনীতে 'বেঙ্গালা' নামক দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেঙ্গালা শহরের অবস্থিতি সম্পর্কে পন্ডিতবর্গের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও 'বেঙ্গালা' রাজ্য যে বাংলা অঞ্চলকে বুঝাতো সে

বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে ১২০৪ সালে মুসলামানদের বাংলা বিজয়ের ইতিহাস রচনার সময় বরেন্দ্র, রাঢ় ও বঙ্গ নাম উল্লেখ করেছেন। মিনহাজ-ই-সিরাজের পরবর্তী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'বাঙ্গালা' শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৫]

'বঙ্গদেশ' এর জনপদগুলো মিলে যদিও চৌদ্দ শতকে গড়ে উঠে 'বাঙ্গালাহ্' তবে তার অধিবাসীদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি বাঙালি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠতে সময় লাগে আরও কয়েকশো বছর। ঠিক কখন থেকে এই ভূ-খন্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজেদের বাঙ্গালি হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করেন তা নির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন, তবে আত্মপরিচয়ের এ অভিধা ইংরেজ শাসনামলে উনিশ শতকে ক্রমাগতভাবে জোরালো হয়ে উঠে। সম্ভবত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন কালে 'শাসকরা ভাবেননি কিন্তু তৈরি হয়েছে' এমন একটি ফল হিসেবে বাঙালি পরিচয়টি ক্রমাগত ভাবে দানা বেঁধে ওঠে।[৬] ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘলরা এ অঞ্চলের নামকরণ করেছিলেন 'সুবে বাংলা' বা 'সুবায়ে বাংলা'। ইংরেজরা এদেশে এলে তারা এর নামকরণ করেন 'বেঙ্গল' (Bengal)। এরপর থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত বাংলা অঞ্চল ভারতবর্ষের একটি প্রদেশ হিসেবে 'পূর্ববাংলা' নামে পরিচিত ছিল।

সুতরাং বলা যায় যে, প্রাচীন জনপদ 'বঙ্গ' থেকে মধ্যযুগে 'বাঙ্গালাহ্' বা 'বাঙ্গালা' মুঘল শাসনামলে 'সুবেহ বাংলা', পর্তুগীজদের 'বেঙ্গালা', আধুনিক যুগে তথা ব্রিটিশ শাসনামলে 'বেঙ্গল/Bangal', পাকিস্তান শাসনামলে 'পূর্ববঙ্গ/পূর্ববাংলা/পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিতি লাভ করে এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পর 'বাংলাদেশ' নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

১.২ বাংলা প্রদেশের উদ্ভব ও বিকাশ

বঙ্গদেশ প্রাচীনকালে বহু জনপদে বিভক্ত ছিল। যেমন: বঙ্গ, রাঢ়, সুক্ষ্ম, তাম্রলিপ্ত, গৌড়, পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ। এসব জনপদের মধ্যে 'বঙ্গ' একটি অতি প্রাচীন জনপদ। মহাভারতের যুগে 'বঙ্গ' একটি শক্তিশালী জনপদ হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে বাংলার বিভিন্ন জনপদের সীমা-রেখা ও নাম বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম ছিল।[৮] কালিদাসের রঘু বংশে (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে) উল্লেখিত হয়েছে যে, গঙ্গার দু'মোহনার অন্তর্বতী ব-দ্বীপটি অর্থাৎ গঙ্গার দু'প্রধান স্রোতধারা ভাগীরথী/পদ্মার মধ্যবর্তী ত্রিভূজাকার ভূ-খন্ডটি হচ্ছে 'বঙ্গ'। আরও আগে, প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন ক্ল্যাসিকাল লেখকগন, এ অঞ্চলকেই আখ্যা দিয়েছেন 'গঙ্গারিডই' হিসেবে।[৯] বাংলায় মুসলমান শাসকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে 'বঙ্গ' বলতে বোঝাতো কেবল বাংলার সে অংশকে যার অবস্থিতি ছিল ভাগীরথী নদীর পূর্বদিকে। ভাগীরথীর পশ্চিমাংশকে বলা হত 'রাঢ়'। এর উত্তর পশ্চিমাংশে ছিল 'অঙ্গ' আর দক্ষিনাংশে 'কলিঙ্গ'।[১০]

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, মৌর্য সম্রাট অশোকের শাসনামলে (খ্রি: পূ: ২৬৯-২৩২) উত্তরবঙ্গ সহ বাংলার অধিকাংশ অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। মৌর্য যুগের শেষ দিকে বিশেষ করে সম্রাট অশোকের শাসনামলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বা জনপদে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করে। মৌর্য আমলে বাংলা অঞ্চলের প্রজারা সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতো।

গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের শাসনামলে (খ্রিষ্টাব্দ ৩৩৫-৩৭৬) বাংলার বেশির ভাগ অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজের অন্তর্ভূক্ত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গের সুক্ষ্ম এবং রাঢ় অঞ্চল নিয়ে 'গৌড়' নামে এক রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। মূলত,

এ সময় থেকেই বাংলা 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' এ দুটি রাজ্যের নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও পূর্ববঙ্গ নিয়েই বঙ্গ রাজ্য গড়ে উঠেছিল। অপরদিকে গুপ্তপরবর্তী ধ্বংসাবশেষ হতেই ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা শশাঙ্কের স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল উত্তর ও পশ্চিম বাংলা নিয়ে।[১১] শশাঙ্কের পরবর্তী শতাব্দীকাল বাংলার ইতিহাস হতাশার ও অরাজকতার ইতিহাস। এরূপ অরাজক পরিস্থিতি এবং বিশৃঙ্খলাকে বলা হয়েছে 'মাৎস্যন্যায়'। এ অবস্থার মধ্যেই অষ্টম শতাব্দীতে গোপাল নামক জনৈক ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন এবং সমগ্র বাংলায় তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে মনে করেন যে, গোপাল জনগণ কর্তৃক রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর বংশধরগণ পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পাল রাজারা প্রায় চারশ বছর (আনুমানিক ৭৫০-১১৪০ খ্রিঃ) স্বাধীন ভাবে শাসন করেন।[১২]

পাল যুগের শেষদিকে বঙ্গদেশ উত্তর ও দক্ষিন এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। পাল শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বাংলা বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। এ সময় রাজধানী নগরী ছিল ৩টি, যথাঃ বিক্রমপুর, গৌড় এবং নদীয়া। পাল বংশের পতনের পর সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার ক্ষমতা অধিকার করেন। সেন বংশ ছিল বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন হিন্দু রাজবংশ।[১৩]

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেকের একজন ক্ষুদ্র সেনা নায়ক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী এক অতর্কিত আক্রমনে রাজা লক্ষণ সেনকে পরজিত করে বাংলার অন্যতম রাজধানী নদীয়া দখল করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ ই-সিরাজ এর মতে, নদীয়া জয় করে ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজী লক্ষনাবতী বা গৌড় দখল করেন। লক্ষনাবতী নগরী ধ্বংস হলে আবার নতুন নগরী স্থাপন করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় লখনৌতি। লখনৌতি (বর্তমান দিনাজপুরের দেবকোট) বখতিয়ার খিলজির রাজধানীতে পরিণত হয়। মূলত, বাংলা তখন থেকে দিল্লির অধীন একটি আধা-স্বাধীন প্রদেশ বা রাজ্যে পরিণত হয়।[১৪]

দিল্লির অনুগত সোনারগাঁয়ের শাসক বাহরাম খান ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর বর্মরক্ষক ফখরা "সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ" উপাধি ধারণ করে সোনারগাঁও এর সিংহাসন অধিকার করেন। মূলত তার স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়েই বাংলায় স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা হয়। তাঁর শাসনামলেই চট্রগ্রাম অঞ্চল মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে এবং বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। সোনারগাঁয়ের এ স্বাধীন শাসকের সময়ে ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বাংলায় এসেছিলেন। ১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর শাসনামলে বাংলার সামরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল ছিল।[১৫] এরপর ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে হাজী শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ লখনৌতির ক্ষমতা দখল করেন। প্রথমে তাঁর রাজধানী ছিল ফিরুজাবাদ বা পান্ডুয়া। তিনি ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও অধিকার করেন এবং সমগ্র বাংলার অধিপতি হন। তিনিই ছিলেন সমগ্র বাংলার প্রথম মুসলমান স্বাধীন সুলতান। এজন্য ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন।[১৬]

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, ১৪১১ খ্রিস্টাব্দের পর রাজা গনেশ ও তাঁর বংশধরগণ প্রায় ত্রিশ বছরকাল বাংলা শাসন করেছিলেন। এরপর কয়েকজন হাবশী শাসক দেশ শাসন করেন। অবশেষে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে অত্যাচারী হাবশী-শাসনের অবসান ঘটে এবং উজির সৈয়দ হুসেন 'আলাউদ্দীন হুসেনশাহ' উপাধি ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। সূচিত হয় শান্তি ও শৃঙ্খলার যুগ, উন্নতি ও সমৃদ্ধির যুগ।[১৭] ডঃ এম.এ. রহিম প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, হুসেন শাহী-শাসনামলে বাংলায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সামরিক ক্ষেত্রে সাফল্য ও বাঙ্গালি প্রতিভার বহুমুখী বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

বাংলার স্বাধীনতা একাধারে ১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু'শবছর ধরে অটুট ছিল। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শেরশাহ্ গৌড় দখল করলে বাংলার স্বাধীনতা ভূলুন্ঠিত হয়। এরপর ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুঘল বাদশাহ হুমায়ুন গৌড় দখল করেন এবং বাংলা মুঘলদের প্রদেশে পরিণত হয়। এর নাম দেয়া হয় 'সুবে বাংলা'। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে

শেরশাহ্ দিল্লির সিংহাসন লাভ করায় বাংলা দিল্লির আফগান সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত হয়। বাংলায় কররানী আফগানরা প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও অনেকটা স্বাধীন ভাবেই বাংলা ও বিহার শাসন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে দাউদ খান কররানী প্রকাশ্যে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করলে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা আক্রমন করার নির্দেশ দেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে মুঘলবাহিনীর হাতে আফগানরা পরাজয় বরণ করেন। বাংলা আবার দিল্লির মুঘল শাসনাধীনে চলে যায়। তবে মুঘল বাদশা আকবর সমগ্র বাংলা দখলে আনতে পারেন নি। এসময় বাংলার 'বার ভূঁইয়া'রা স্বাধীন ভাবেই নিজ নিজ এলাকা শাসন করেছিলেন।

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর বাংলা প্রদেশকে ১৯টি প্রশাসনিক সরকারে (বিভাগ) বিভক্ত করেন। এ ১৯টি সরকারকে আবার ৬৮৯টি মহলে বিভক্ত করা হয়। মুঘল সম্রাট নিযুক্ত বাংলার প্রাদেশিক সুবাদার ইসলাম খান ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি মুঘল সম্রাট্ জাহাঙ্গীর এর নামে ঢাকার নাম রাখেন 'জাহাঙ্গীরনগর। সুবাদার ইসলাম খান ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় সমগ্র বাংলাকে মুঘল অধীনে আনয়ন করেন। উল্লেখ্য যে, মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫-১৬২৭) ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। এরপর সম্রাট শাহ্জাহান ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ সুজাকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। শাহজাদা সুজা রাজধানী ঢাকা থেকে রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে সুবেদার শাহজাদা সুজা বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকা রাজস্বের বিনিময়ে সমগ্র বাংলায় বিনা শুল্কে ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে মীর জুমলা বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন এবং পুনরায় রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করেন। ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খান ইংরেজ বনিকদের বিনা শুল্কে বাংলায় বানিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব একটি ফরমান জারি করে ইংরেজ বনিকদের মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধ বানিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন। তাঁর নিকট হুগলী নদীর মোহনায় নৌ-ঘাটি স্থাপনের আবেদন করে ব্যর্থ হলে ইংরেজ বণিকরা ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে

Dhaka University Institutional Repository

হুগলী, বালেশ্বর এবং হিজলীর মুঘল দূর্গ এবং ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম আক্রমন করে। কিন্তু শায়েস্তা খান ইংরেজ বনিকদের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দেন।[১৮]

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র শাহজাদা আজিমুদ্দীন বাংলার সুবেদার থাকাকালে ইংরেজরা ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে সুতানুটিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে সুবেদার ইব্রাহীম খান পূর্বের মতোই বার্ষিক তিন হাজার টাকা রাজস্বের বিনিময়ে বিনা শুল্কে ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ স্থাপন করে। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে জব চার্নক মাত্র বারোশত টাকার বিনিময়ে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক গ্রাম তিনটির জমিদারি কিনে নেন।

১৭০০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমে বাংলার দেওয়ানী কার্যাবলী ঢাকা হতে স্থানান্তরিত করে যেখানে স্থাপন করেন তা তাঁর নামানুসারে মুর্শিদাবাদ নামে পরিচিত হয়। ১৭১৭ সালে নিজামত ও দেওয়ানী লাভের সাথে 'নবাব' উপাধী ধারণ করে তিনি ধীরে ধীরে অনেকটা স্বাধীন ভাবেই বাংলা শাসন করতে থাকেন। দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নবাব মুর্শিদকুলী খান বাংলায় ইংরেজ বণিকদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার সুযোগ প্রদানে অসম্মত হন। ফলে ইংরেজ বণিকরা চিকিৎসক হ্যামিল্টন ও সুরম্যানকে নিজেদের বানিজ্যিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে দিল্লির সম্রাট ফররুখশিয়রের নিকট প্রেরণ করেন। সুদক্ষ চিকিৎসক হ্যামিল্টন সম্রাট ফররুখশিয়রকে এক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য করে তোলেন। এরই কৃতজ্ঞতার প্রতিদানস্বরূপ দিল্লির সম্রাট ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে এক ফরমান বলে বাংলায় বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করার অধিকার প্রদান করেন।

মুর্শিদকুলী খানের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর জামাতা সুজা-উদ-দীন খাঁ বাংলার নবাব (১৭১৭-১৭৩৯) হন। তাঁর শাসনামলে বাংলার সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা

দেখা দেয়। এ সুযোগে বিহারের নায়েবে নাজিম আলীবর্দী খাঁ প্রভুকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেই বাংলা, বিহার ও উড়ীষ্যার নবাব ও সুবেদার হন। নবাব আলীবর্দী খাঁ প্রায় স্বাধীন ভাবেই বাংলা বিহার ও উড়ীষ্যা শাসন করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরবর্তী নবাব মনোনীত করে যান।[১৯]

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব হন। ক্ষমতায় আরোহন করেই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা খালা ঘসেটি বেগম, খালাতো ভাই শওকত জং এবং অমাত্যবর্গের একটি বড় অংশের ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নানা কারণে ইংরেজদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। নবাবের আদেশ অমান্য করে ইংলিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় দূর্গ নির্মান অব্যাহত রাখে। তিনি অবাধ্য ইংরেজদের শাস্তি দেয়ার জন্য অগ্রসর হন এবং ১৭৫৭ সালের ৪ জুন ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাশিম বাজার বাণিজ্য কুঠি অধিকার করেন। ২০ জুন নবাব কলিকাতা দখল করেন এবং সেনাপতি রাজা মানিকচাঁদের উপর কলিকাতার শাসনভার অর্পন করে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর নবাব পুর্ণিয়ার অবাধ্য নায়েবে নাজিম শওকত জংকে দমনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। ১০ অক্টোবর মনিহারি নামক স্থানে এক যুদ্ধে শওকত জং পরাজিত ও নিহত হন।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ধূর্ত কর্মকর্তাগণ এ সময় কৌশলী ভূমিকা পালন করেন। তারা নবাবের সভাসদ ও আমত্য উমিচাঁদ, রাজা মানিকচাঁদ, রাজা রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ প্রমুখের সাথে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হন। কলিকাতায় নিয়োজিত নবাবের সেনাধ্যক্ষ রাজা মানিকচাঁদের সাথে সমঝোতা করে ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারি রবার্ট ক্লাইভ ও এ্যাডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে একদল সৈন্য ও নৌবহর কলিকাতা আক্রমন করলে মানিকচাঁদ কোন বাঁধা প্রদান না করে কলিকাতা থেকে সরে পড়েন। ফলে সহজেই ক্লাইভ ও ওয়াটসন বাহিনী কলিকাতা শহর ও ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ দখল করে নিতে সক্ষম হন। বাধ্য হয়ে নবাব স্বয়ং তাঁর সেনা বাহিনী নিয়ে ১৭৫৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি কলিকাতার উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে ক্লাইভ-ওয়াটসন বাহিনী সেনা শিবিরে অতর্কিত আক্রমন করলে নবাবের

Dhaka University Institutional Repository

সেনাবাহিনী যদিও তা প্রতিহত করে কিন্তু আহমদ শাহ আবদালী এসময় বিহার আক্রমন করতে উদ্যত হলে নিরূপায় নবাব ইংরেজদের সাথে একটি সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সম্পাদিত এ সন্ধি 'আলীনগরের সন্ধি' নামে পরিচিত। এ সন্ধির ফলে নবাব ইংরেজদের বাণিজ্য সুবিধা প্রত্যার্পন করেন এবং বিনিময়ে ইংরেজরা নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

আলীনগর চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ (সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ) শুরু হলে ইংরেজরা কলিকাতায় ফারসীদের চন্দননগর বানিজ্য কুঠি আক্রমন করতে উদ্যত হয়। নবাব ইংরেজদেরকে সন্ধির শর্ত মেনে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ নবাবের আদেশ অমান্য করে ১৭৫৭ সালের ২৩ মার্চ চন্দননগর কুঠি দখল করেন। এসময় নবাবের বিশ্বস্ত সেনাদল বিহার সীমান্তে আহমদ শাহ্ আবদালীর সম্ভাব্য আক্রমন প্রতিরোধের জন্য নিয়োজিত থাকায় নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক কোন সামরিক ব্যবস্থা নিতে পারেননি। ইতোমধ্যে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুচতুর সেনাধ্যক্ষ ও কর্মকর্তারা নবাবের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও অমাত্যদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন এবং এরপর তারা সিরাজ-উদ-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকেন। তারা অত্যন্ত গোপনে এর দায়িত্ব উমিচাঁদের উপর অর্পন করেন। উমিচাঁদ নবাবের প্রধান সেনাধ্যক্ষ মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসানোর লোভ দেখালে অকৃতজ্ঞ মীর জাফরও এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইয়ার লতিফ, খাদিম হোসেন, রাজা রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ওয়াটসন নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রের নীল নকশা প্রণয়নের জন্য জগৎশেঠের বাসভবনে গোপনে মিলিত হন।[২০]

রবার্ট ক্লাইভ যখন নিশ্চিত হলেন যে, ষড়যন্ত্রকারীরা নবাবের বিরুদ্ধে কাজ করবেন তখন ১৭৫৭ সালের ১২ জুন তার সেনাবাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ক্লাইভকে বাধা দেয়ার জন্য ৫০,০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে নিজে মুর্শিদাবাদ হতে যাত্রা করেন এবং পলাশী প্রান্তরে সৈন্য শিবির স্থাপন করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন

পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে নবাবের অনুগত ও বিশ্বস্ত সেনা নায়ক মোহন লাল ও মীরমদনের আক্রমনে ক্লাইভের সেনাবাহিনী পিছু হটে আম্রকুঞ্জের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এসময় ইংরেজ সৈন্যদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে গোলন্দাজ বাহিনীর সেনা নায়ক মীরমদন নিহত হলে নবাব ভেঙ্গে পড়েন এবং সেনাধ্যক্ষ মীর জাফর আলী খানকে ডেকে পাঠান। মীর জাফর সেদিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ রাখার পরামর্শ প্রদান করেন এবং শপথ করে বলেন যে, পরদিন তাঁরা সকলে মিলে ইংরেজ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করবেন। কোমলমতি তরুন নবাব বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং মোহন লালকে যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দেন। জয়ের মুখে নবাবের এরূপ আদেশে সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং তারা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। রবাট ক্লাইভের সেনাবাহিনী এ সময়ে আম্রকুঞ্জের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে নবাব বাহিনীকে আক্রমন করে। মীর জাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ প্রমুখ বিশ্বাসঘাতক সেনা নায়কগণ এবারে সরাসরি রবার্ট ক্লাইভের সেনাবাহিনীর পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং নবাবভক্ত সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে সেনানায়ক মোহনলাল মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ চলিয়ে যান। নবাব দ্রুত মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিক্ষিপ্ত সেনাদেরকে সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভবিষ্যতে সেনা সংগ্রহ করে পুনরায় যুদ্ধ করার মানসে নবাব স্ত্রী লুৎফুন্নেসা ও একমাত্র কন্যাকে সাথে নিয়ে রাজমহল হয়ে পাটনার দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিমের সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁকে মুর্শিদাবাদে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়। ১৭৫৭ সালের ২ জুলাই মীর জাফরের পুত্র মীরণের আদেশে মুহাম্মদী বেগ এর ছুরিকাঘাতে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নিহত হন। এভাবে পালশীর প্রন্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় এবং বাংলায় ও সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ তৈরী হয়। [২১]

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ বাংলায় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা

পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মদদপুষ্ট হয়ে মীর জাফর আলী খান বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব হন।[২২] ধীরে ধীরে বণিকের ছদ্মবেশ থেকে বেরিয়ে এসে রবাট ক্লাইভ ও ইংলিশ ইস্ট ইন্ডয়া কোম্পানির ব্যবহার হয়ে ওঠে প্রভূ সূলভ ও কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক। মীর জাফর বাংলার নবাব হলেন কিন্তু প্রকৃত শাসক হতে পারলেন না। কেননা পর্দার অন্তরাল থেকে এবং সময়ে সময়ে প্রকাশ্যে ইংরেজরা নবাবকে প্রভাবিত করতে শুরু করে।[২৩]

রবার্ট ক্লাইভ নবাব মীর জাফরকে তার সেনাবাহিনীর অর্ধেক সিপাহীকে বরখাস্ত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। নবাবের আর্থিক ঘাটতি লাঘব ছাড়াও সামরিক দিক থেকে দুর্বল করে ফেলার জন্যই ক্লাইভ এই পথ বেছে নেন। নবাব মীর জাফর আলী খান অনন্যোপায় হয়ে সেনাবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করতে বাধ্য হন। ইংরেজদের আচরণ মীর জাফরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ইংরেজদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হবার জন্য নবাব মীরজাফর আলী খান গোপনে ওলন্দাজ ও আর্মেনিয়ান বণিকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সচেষ্ট হন। এ সময়ে ক্লাইভের স্থলে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন হেনরি ভ্যান্সিটার্ট। ভ্যান্সিটার্ট মীরকাশিম আলী খানকে মুর্শিদাবাদের নবাবী প্রদান করেন। এই সমঝোতা চুক্তির বিনিময়ে নবাব মীর কাশিম আলী খান গভর্নর ও তার কাউন্সিলকে ২ লক্ষ পাউন্ড প্রদান এবং ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্রগ্রাম এই তিনটি জেলা হস্তান্তর করেন। ষড়যন্ত্র করে ইংরেজ কোম্পানির আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে নবাব হলেও মীর কাসিম আলী খান বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজদের প্রভাব ও কর্তৃত্বমুক্ত হতে না পারলে নবাব পদে অধিষ্ঠিত হওয়া আদৌ মর্যাদাকর নয়। একারণে তিনি ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী সরিয়ে নেন মুঙ্গেরে। তিনি তার সেনাবাহিনী দক্ষ ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে

তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের বেপরোয়া আচরণ, ব্যক্তিগত বাণিজ্য এবং কোম্পানির দস্তক ব্যবহার করে কর ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[২৪] এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে মীর কাসিম এর বিরোধ শুরু হয়। এসময় পাটনার ইংরেজ কুঠির এজেন্ট এলিস পাটনা শহর আক্রমন করলে নবাব মীর কাসিম খান তা ব্যর্থ করে দেন এবং পাটনার ব্রিটিশ সেনা ছাউনি ধ্বংস করে দেন। সুচতুর ইংরেজগণ মীর কাসিমকে সরিয়ে আবারো মীর জাফর আলী খানকে সিংহাসনে বসানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কলকাতা থেকে মেজর এডামসের সৈন্য দল মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়। মেজর এডামস ১৭৬৩ সালের ২৪ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে মীর জাফর আলী খানকে দ্বিতীয়বারের মতো মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংরেজ বাহিনী ও মীর জাফরের অনুগত নবাবী সৈন্যরা মিলিতভাবে মীর কাসিম আলী খানকে আক্রমন করেন।

মীর কাসিম আলী খান কটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, সূতী ও উদায়নালার যুদ্ধে মীর জাফর আলী খান ও ইংরেজদের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। এরপর মীর কাসিম মুঙ্গেরে আশ্রয় নিলে ইংরেজ ও মীর জাফর বাহিনী তা দখল করে নেয়। ১৭৬৩ সালের ৬ নভেম্বর পাটনার যুদ্ধে মীর কাসিম আলী খান আবারো পরাজিত হন। এসময় মীর কাসিম আলী খান অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মীর কাসিম, নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলমের মিলিত বাহিনী বিহারের দিকে আগ্রসর হলে ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মনরো বক্সারের নিকট সম্মিলিত বাহিনীর গতিরোধ করে। নবাব সুজাউদ্দৌলা প্রথমে রোহিলাখন্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরে দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের মতোই ইংরেজদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হন। ফলে নবাব সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাবী ফিরে পান। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরাসরি রাজনৈতিক শাক্তিতে পরিণত হলো। এভাবে পলাশীর যুদ্ধে বাংলায় ইংরেজ শক্তি স্থাপনের যে প্রস্তুতি শুরু হয়, তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে বক্সারের যুদ্ধে।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৭৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে মীর জাফরের মৃত্যু হলে ইংরেজরা তার পুত্র নাজিম-উদ-দৌলা কে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসান। তবে নাজিম-উদ-দৌলা এবারে উপাধি প্রাপ্ত হন 'নবাব নাজিম' অর্থাৎ শুধু নিজামত পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত নবাব। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা হয়ে পড়েন নবাব নির্মাতা কিন্তু বক্সার যুদ্ধের পর ইংরেজদেরকে আর পর্দার আন্তরালে থাকতে হয়নি; সরাসরি ক্ষমতার মূল বিন্দুতে এসে পৌঁছাতে সক্ষম হন।

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধের পর ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রবার্ট ক্লাইভকে দ্বিতীয়বারের মতো কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের গর্ভনর করে পাঠান। ক্লাইভ অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলার কাছ থেকে বক্সারের যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদ ও কারা জেলা দু'টি আদায় করেন। ক্লাইভ দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলমের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা 'এলাহাবাদ চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুসারে ক্লাইভ এলাহাবাদ ও কারা জেলা দুটি দিল্লীর সম্রাটকে প্রদান করেন। এবং বিনিময়ে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা বিহার, উড়িষ্যার 'দিউয়ানী' লাভ করে। অর্থাৎ এলাহাবাদ চুক্তি অনুসারে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সাধারন শাসন ও আইন-শৃঙ্খলার (নিজামত) দায়িত্ব থাকলো নবাবের হাতে এবং কোম্পানী রাজস্ব আদায় করে তা থেকে দিল্লীর সম্রাটকে দেবে ২৬ লক্ষ টাকা এবং প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য মুর্শিদাবাদের নবাবকে প্রদান করবে ৫৩ লক্ষ টাকা। রবার্ট ক্লাইভ বাংলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পন করেন সৈয়দ মুহাম্মদ রেজা খানের উপর এবং বিহারের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পন করেন সিতাব রায়ের উপর। এ দুজনকে উপাধি প্রদান করা হয় 'নায়েব দিউয়ান'। এ নায়েব দিউয়ানের কাজকর্ম তদারক করার জন্য মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দুজন ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। মুহাম্মদ রেজা খান মীর জাফরের নাবালক পুত্র নবাব নাজিম-উদ-দৌলার 'নায়েবে নাযিম' নিযুক্ত হন । এই শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় 'দ্বৈত শাসন' বা এ্যাংলো-মোঘল যৌথ শাসন। এ ব্যবস্থায় নবাবের ছিল ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পায় দায়িত্বহীন ক্ষমতা।[২৬]

পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই দ্রুতগতিতে রাজস্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭৬৭ সালে ক্লাইভ বিলাতে প্রত্যাগমন করলে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নায়েব দিউয়ানের উপর অধিক রাজস্ব আদায়ের তাগিদ দিতে থাকে। ফলে অনন্যোপায় হয়ে নায়েব দিউয়ানরাও প্রজাদের উপর অধিকহারে রাজস্ব চাপিয়ে দিতে বাধ্য হন। দ্বৈতশাসনের নামে কুশাসনের সুযোগে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয় এবং নিজ নিজ সম্পদ বৃদ্ধির ও অবৈধভাবে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে উৎসাহী হয়ে উঠে। এছাড়াও ১৭৬৮ সালে বাংলায় শুরু হয় খরা, অনাবৃষ্টির মতো প্রাকৃর্তিক দুযোর্গ। অব্যাহত এই খরা অনাবৃষ্টির জন্য ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) এক মহাদুর্ভিক্ষ সমগ্র বাংলাকে গ্রাস করে ফলে, যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে খ্যাত। এ মহাদুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করে।[২৭] ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত সময়কালে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে ভারতের জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ফলে কোম্পানির এসব কার্যকলাপের অনুসন্ধান ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করার জন্য ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' নামে এক আইন পাশ করে । এ আইন অনুসারে প্রথমত, কোম্পানীর বাণিজ্যিক এলাকা শাসনের জন্য একজন গর্ভনর জেনারেল এবং চারজন পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয়ত, বাংলা বিহার, উড়িষ্যার সামরিক ও বেসামরিক শাসনভার কোম্পানির উপর ন্যস্ত করা হয়। তৃতীয়ত, গর্ভনর জেনারেল ও তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় এবং গর্ভনর জেনারেলকে চূড়ান্ত মতামতের ক্ষমতা দেওয়া হয়।[২৮] ওয়ারেন হোস্টিংসকে প্রথম গর্ভনর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। এরপর ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের 'পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট', ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের রাজস্বশাসন ব্যবস্থায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের 'সেনাবাহিনী গঠন আইন', ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের 'সনদ আইন' পাশের মাধ্যমে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গঠন ও শাসনতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়।

ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বৈষম্যমূলক আচরণ ও দীর্ঘ দিনের অসন্তোষের কারণে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক 'সিপাহী বিদ্রোহ'। এ বিদ্রোহ স্বাধীনতার সংগ্রাম বা মহা বিদ্রোহ নামেও পরিচিত। যদিও সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থতায়

Dhaka University Institutional Repository

পর্যবসিত হয় তা সত্ত্বেও এটি ছিল ভারতের শাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এ বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে (আন্দোলনের প্রধান নেতা) ইংরেজ সরকার রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে। এ আন্দোলনের ফলে এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়। কোম্পানির রাজত্বের অবসান হয়। ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণা দ্বারা এই পরিবর্তন সাধন করেন। সরাসরি ইংরেজ রাজার নামে ও তাঁর কর্তৃত্বাধীনে এদেশ শাসিত হতে থাকে। ১৮৫৮ সালে ভারত সরকারের শাসনতন্ত্র আইন পাশ হয় এবং আইন অনুসারে একজন ভারত সচিব নিযুক্ত হন। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি ইংরেজ সরকার অধিকার করে। বোর্ড অব কন্ট্রোল তুলে দেয়া হয় এবং যাবতীয় সামরিক ও সেনাবাহিনী ইংরেজ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসে।[২৯] এরপর থেকে পূর্ববাংলা ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

১.৪ পূর্ববাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন 'ওহাবী' ও 'ফরায়েজী' আন্দোলন নামে পরিচিত।[৩০] ইংরেজ শাসনের প্রভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ায় মুসলমানরা যে হতাশায় নিমজ্জিত হন তা দূর করার জন্যই এ আন্দোলন পরিচালিত হয়। মৌলিক সংস্কারের মাধ্যমে আদিম ইসলামের প্রত্যাবর্তন করাই ওহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলনের মূল্য লক্ষ্য ছিল।[৩১] ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনরূপে আরম্ভ হলেও পরবর্তীতে উভয় আন্দোলনই অর্থেনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে।[৩২] কিন্তু রক্ষণশীল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে উভয় আন্দোলনই ছিল প্রগতিশীল চিন্তার বিরোধী। আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান সমাজের যোগাযোগ ঘটেনি বলে মুসলমানদের সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও ওহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেনি।[৩৩] এখানে উল্লেখ্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় তা মূলত বাংলার নিম্ন

শ্রেণির দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবস্থাপন্ন মুসলমানরা এতে যোগ দেননি বা এর দ্বারা প্রভাবিতও হননি।[৩৪]

এসময় ইংরেজ শাসনের প্রভাবে বাংলায় যে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি গড়ে উঠে কালক্রমে ঐ শ্রেণির মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত হয় যার ফলে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ দানা বেঁধে ওঠে। তাঁদের এ চেতনাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন ধরণের সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।[৩৫] ঊনিশ শতকে বাংলার শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতিগুলির মধ্যে বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি (১৮৩৭); বেঙ্গল বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৪৩); বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৫১); ও ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৭৪) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৬] বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজে জাতীয় চেতনার বিকাশে এ সকল সংস্থা ও সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলার মুসলমান সমাজে এ সময় নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতি না থাকার কারণে তাদের মধ্যে যেমন রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা বিকশিত হয়নি তেমনি কোন রাজনীতি সচেতন শ্রেণিও গড়ে ওঠেনি।

মুসলমানদের মানস চেতনায় এক বড় ধরনের পরিবর্তন আসে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এ সময় আর্থ-সামাজিক দিক থেকে হিন্দুদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন। আর এরূপ অনুভূতি থেকেই এ সময় মুসলমানদের মধ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৫ সালের ৬ই মে কলকাতার বেশ কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় মুসলমানের উদ্যোগে 'মহামেডান এসোসিয়েশন' বা 'আঞ্জুমান-ই-ইসলামী' নামে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম সংগঠন স্থাপিত হয়।[৩৭] সংগঠনটি ছিল বৃটিশ সরকারের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুগত এবং ভারতের মুসলমানদের কল্যাণ সাধনই এর উদ্দেশ্য ছিল। ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে 'মহামেডান এসোসিয়েশন' ছিল প্রথম সংঘবদ্ধ সাংগঠনিক প্রয়াস।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর মুসলমানরা আরও সচেতন হয়ে ওঠেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, ভারতে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তি প্রয়োগ দ্বারা এর উচ্ছেদ সাধন করা সম্ভব নয়। অতএব, মুসলমানদের অগ্রগতি সাধন করতে হলে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক।[৩৮] এরূপ পরিবর্তিত মানসিকতার প্রেক্ষাপটে মুসলমান সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে তাঁদের মধ্যে এক নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য যে সকল সমাজকর্মী নেতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান[৩৯] এবং বাংলায় নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নবাব আবদুল লতিফ বাংলার পশ্চৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়কে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ ও নবমন্ত্রে দীক্ষিত করে তাঁদের মধ্যে আত্মসচেতনতা ফিরিয়ে আনতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণে প্রথম থেকেই তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা দুটি লক্ষ্য স্থির করে পরিচালিত হয়। একটি হল মুসলমানদেরকে ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুগত করে তোলা এবং অপরটি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার করা।[৪০] বস্তুতঃপক্ষে মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যার বিষয়টি ১৮৫০ সালের পর থেকেই নবাব আবদুল লতিফের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমান সমাজের উন্নয়নে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে জনমত গঠনের জন্য নবাব আবদুল লতিফ ১৮৫৩ সালে সারা ভারতের মুসলমান ছাত্র সমাজের নিকট থেকে "On the advantages of an English Education to Mohamedan Students" শিরোনামে ফারসী ভাষায় এক রচনা প্রতিযোগিতার আহবান করেন।[৪১] তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৫৪ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফরাসী বিভাগ খোলা হয়। বাংলার মুসলমানদের জন্যে উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নবাব আবদুল লতিফ সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট যে দাবি জানান তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং মুসলমান ছাত্ররা সেখানে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ

Dhaka University Institutional Repository

করে। মহসীন ফান্ডের[৪২] অর্থে হুগলী কলেজ ১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে হিন্দু ছাত্রদের প্রাধান্য দেখে নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬১ সাল থেকেই ঐ তহবিলের সঠিক পরিচালনার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। অবশেষে তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৮৭৩ সালে সরকার হুগলী কলেজের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ করে এবং মহসীন ফান্ডের অর্থে ঢাকা, চট্রগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপন এবং মুসলমান ছাত্রদের কল্যাণে বৃত্তি প্রদান ও যে সকল কলেজে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়া হয় সে সকল কলেজে অধ্যায়নরত মুসলমান ছাত্রদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ প্রদানের ব্যবস্থা করে।[৪৩]

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইংরজী শিক্ষা বিস্তারের গতিকে ত্বরান্বিত এবং এ ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নবাব আবদুল লতিফ দুটি পান্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেন। প্রথম নিবন্ধটি 'A Minute on the Hoogly Madrassah' শীর্ষক শিরোণামে ১৮৬১ সালে রচিত এবং কলকাতা থেকে ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় নিবন্ধটির শিরোণাম 'A Paper on Mohamedan Education in Bengal'। এ নিবন্ধটি নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন'-এর সভায় পাঠ করেন। উভয় নিবন্ধে নবাব আবদুল লতিফ শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ বাংলার মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য বৃটিশ সরকারের নিকট বেশ কিছু সুপারিশ করেন।[৪৪]

বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণে নবাব আবদুল লতিফ যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি ব্যাপক সাংগঠনিক কর্মসূচীও হাতে নেন। এ কর্মসূচীর আওতায় তিনি ১৮৬৩ সালে কলকাতায় 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নবাব আবদুল লতিফ তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'A Short Account of My Public Life (1885)'-এ বলেন যে, "Being fully

Dhaka University Institutional Repository

aware of the prejudice and exclusiveness of the Mohamedan community, and anxious to imbue its members with a desire to interest themselves in Western learning and progress, and to give them an opportunity for the cultivation of social and intellectual intercourse with the best representatives of English and Hindoo society, I founded the Mohamedan Literary Society in April 1863".[৪৫]

ভারতীয় মুসলমান সমাজে এ জাতীয় সংগঠন এই প্রথম স্থাপিত হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অনুবাদ সমিতি (পরবর্তীতে বিজ্ঞান সমিতি নামে পরিচিত) আরো এক বছর পর জন্ম লাভ করে। এতদিন পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন মুখপাত্র না থাকার কারণে তাঁদের পক্ষে কথা বলার বা তাঁদের অভাব অভিযোগ সমূহ সরকারের নিকট তুলে ধরার কোন ব্যবস্থা ছিল না। 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' মুসলমানদের এ প্রয়োজন মেটায়। সংগঠনটির কার্যধারা ছিল দ্বিমুখী: আলোচনা ও রচনা পাঠের মাধ্যমে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য ভাবধারার ঘনিষ্ঠ পরিচয় দান এবং নিজেদের চিন্তা ধারার উন্নতি ও বিকাশ সাধন এবং উপদেষ্টা সমিতির মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে নানা রকম পরামর্শ দান।[৪৬]

'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'- এর মাসিক ও বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠানের নিয়ম ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজ, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে রচনা ও প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে মুসলমানদের আধুনিক চিন্তা ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও ভাব বিনিময় করা।[৪৭] মুসলমানদের অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'-এর পক্ষ থেকে ভারতের বড়লাট ও বাংলার ছোটলাটের কর্মভার গ্রহণ ও দায়িত্বভার ত্যাগের সময় সংবর্ধনা

সভা ও বিদায় সভার নিয়মিত আয়োজন করা হত। এ সকল সভায় পঠিত মানপত্রে মুসলমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি দাওয়ার উল্লেখ থাকত।[৪৮]

বৃটিশ সরকারের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করে তাঁদের আনুগত্য ও সহানুভূতি লাভের জন্য 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' ১৮৭০ সালের ২৩শে নভেম্বর কলকাতায় এক বিশেষ সভা আহবান করে। উল্লেখ্য যে, এ সময় ওহাবীদের বৃটিশ বিরোধী তৎপরতার ফলে অশিক্ষিত শ্রেণির মুসলমানদের মনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা প্রশমনে নবাব আবদুল লতিফ 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' আহূত উক্ত সভায় তৎকালীন সময়ের প্রখ্যাত মুসলিম তাত্ত্বিক মৌলভী কেরামত আলী জৌনপুরীকে আমন্ত্রণ জানান। মৌলভী কেরামত আলী ধর্মীয় নির্দেশাবলী আলোচনা করে বলেন যে, বৃটিশ শাসিত ভারত দার-উল-ইসলাম এবং এখানে শাসকদের বিরূদ্ধে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা ধর্মীয় নির্দেশের পরিপন্থী। এ সভার পুরো কার্যবিবরণীর পাঁচ হাজার কপি ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।[৪৯]

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রেও 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৬৯ সালে স্যার উইলিয়াম গ্রে কলকাতা মাদ্রাসার পশ্চাৎমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য যে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' সে কমিশনের নিকট ঐ বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ করে। এছাড়া ১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ভাইসরয়ের আইন পরিষদের সদস্য ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের সভাপতিত্বে গঠিত ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের কাছে মহামেডান লিটারের সোসাইটি মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নের পথে অন্তরায় সমূহ উপস্থাপনের পাশাপাশি সরকারের শিক্ষা পদ্ধতি, বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা ইত্যাদি বিষয়ও উত্থাপন করে।[৫০]

সামাজিক ও শিক্ষামূলক সংগঠন হিসেবে প্রথমদিকে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'-এর কোন রাজনৈতিক তৎপরতা না থাকলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপদে সোসাইটির কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে এবং সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করতে আরম্ভ

করে। ১৮৯০ সালে সোসাইটি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচনের বিষয় সংক্রান্ত এক স্মারকলিপি ভারত সচিবের নিকট পেশ করে।[৫১] বৃটিশ সরকারও সোসাইটি প্রদত্ত এ স্মারকলিপি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথেই বিবেচনা করে। ১৮৯৩ সালে নবাব আবদুল লতিফ মৃত্যুবরণ করেন ফলে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'-এর কর্মোৎসাহে ভাটা পড়ে।

নবাব আবদুল লতিফের বয়ঃকনিষ্ঠ সৈয়দ আমীর আলী চিন্তার ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রগামী ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী লক্ষ্য করেন যে, হিন্দুরা তাঁদের স্থাপিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সরকারের নিকট থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা আদায় করছে অথচ মুসলমানরাও এ ধরণের সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে। তাই তিনি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আর এরূপ অনুভূতি থেকেই ১৮৭৮ সালে তিনি 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন।[৫২] সৈয়দ আমীর আলী নিজেই এর সম্পাদক হন। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন যে, "The Association has been formed with the object of promoting by all legitimate and constitutional means, the well being of the Mussulman of India. It is founded essentially upon the principle of strict and loyal adherence to the British crown. Deriving its inspiration from the noble traditions of the past, it proposes to work in harmony with western culture and the progressive tendencies of the age. It aims at the political regeneration of the Indian Mohamedans by a moral revival, and by constant endeavors to obtain from Government a recognition of their just and reasonable claims".[৫৩]

'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানদের সংগঠন ছিল। এর সভ্যগণ সাধারণত পেশাজীবী, সরকারী চাকরিজীবী ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। মুসলমানদের সংগঠন হলেও 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় রেখে চলত বলে অমুসলমানরাও এতে যোগদান করতে পারতেন এবং মুসলমানদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্যসব বিষয়ে ভোট দান করতে পারতেন। 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' উচ্চ শ্রেণির হিন্দুদের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে। এর দুজন পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং একজন পরামর্শদাতা ছিলেন হিন্দু। ১৮৮৩ সালে রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিং এসোসিয়েশন-এর অনারেরী ভাইস প্রেসিডেন্ট হন। তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রায়বাহাদুর কৃষ্টোদাস পাল ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এর ন্যায় বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর সদস্য হন।[৫৪]

'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠার প্রথম পাঁচ বছরে এর কার্যক্রম মূলত সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই পরিচালিত হয়। মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করার জন্য এসোসিয়েশন ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের নিকট মুসলমানদের শিক্ষা অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সমূহ তুলে ধরে এবং তা প্রতিকারের বিষয়ে কমিশনকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করে। এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টার ফলেই ১৮৮৪ সালে সরকার কলকাতা মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজে মুসলমান ছাত্রদের জন্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।[৫৫]

রাজনীতির ক্ষেত্রে 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' এর কর্মকান্ড মূলত ভারতের বড়লাট ও বাংলার ছোটলাট এর সংবর্ধনা ও বিদায় সভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠার প্রথম পাঁচ বছরে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল ১৮৮২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ভারতের বড়লাট লর্ড রিপনের নিকট ২৮ পরিচ্ছেদের এক দীর্ঘ স্মারকপত্র প্রদান করা।[৫৬] এতে মুসলমানদের অসুবিধা এবং

Dhaka University Institutional Repository

নানাবিধ সমস্যার কথা লিপিবদ্ধ করে সেগুলো সমাধানের উপায় সম্পর্কে কতগুলো দাবি উত্থাপন করা হয়। এ দাবিগুলোর মধ্যে ছিল মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক চাকুরী সংরক্ষণ এবং চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে তাদের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মান হ্রাস করা, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ না করেও তারা চাকুরীতে প্রার্থী হতে পারে। এতে আরো দাবি করা হয় যে, প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা ছাড়াই যোগ্য মুসলমানদের যেন মনোনয়নের ভিত্তিতে চাকুরীতে নিয়োগ দান করা হয়। তাছাড়া মুসলমানদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও এতে দাবি জানান হয়।[৫৭] 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রদত্ত এ স্বারকলিপির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এর ওপর ভিত্তি করেই ১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই বড়লাট লর্ড ডাফরিন এক প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য সরকারী চাকুরী ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।[৫৮]

সৈয়দ আমীর আলী তাঁর 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন'কে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরে এর শাখা স্থাপন করেন।[৫৯] তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মাদ্রাজ হতে পাঞ্জাব এবং চট্টগ্রাম হতে করাচী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশে এর ৩৪টি শাখা স্থাপিত হয়।[৬০] ১৮৮৩ সালে এ এসোসিয়েশনকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য এর নাম পরিবর্তন করে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' রাখা হয়।[৬১]

১৮৯০ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হলে, 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন'-এর কর্মোদ্দীপনায় ভাটা পড়ে। অন্যদিকে ১৮৯৩ সালে নবাব আবদুল লতিফ মৃত্যুবরণ করলে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'-এর কর্মসূচীও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ফলে সংগঠন দুটি তাদের পূর্বের গৌরব ও কর্মতৎপরতা হারিয়ে ফেলে। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজের উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সমাজ হিতৈষী শিক্ষিত মুসলমানরা নব উদ্দীপনায় সক্রিয় হয়ে উঠেন এবং ১৮৯৩ সালে 'কলকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করেন।[৬২] মুসলমান সমাজের স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষা বিশেষত

শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধান করাই 'কলকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' এর লক্ষ্য ছিল।[৬৩] ইউনিয়নের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের নিয়ম ছিল। ১৯০২ সালে 'কলকাতা মহামেডান ইউনিয়ন'-এর পক্ষ থেকে ভারত সরকারের নিকট মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে এক দীর্ঘ স্মারকপত্র প্রদান করা হয়।[৬৪]

১৮৯৬ সালের মে মাসে কলকাতায় 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন' নামে আরও একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তারা ছিলেন প্রধানত আইনজীবী শ্রেণিভুক্ত। এসোসিয়েশন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত এক সার্কুলারে বলা হয় যে, "All educated Muhammadan gentlemen who have applied themselves to the question of the welfare and progress of their community have long felt the need of an organisation whose deliberations and actions will be guided by a sole regard to its true interests unhampered by any other consideration and which by its constitution will be able to faith fully represent the views of the Muhammadans and at the same time command the confidence of the public in general as well as of the Government".[৬৫]

আইনজীবিদের দ্বারা গঠিত হওয়ায় এ সংগঠনটি মূলত মুসলমান সমাজের আইন সংক্রান্ত সমস্যাগুলিই এর কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করে। এ এসোসিয়েশন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ছিল বলে জানা যায়।[৬৬] কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত এ সকল সংগঠনের অনুকরণে এ সময় বাংলার বিভিন্ন জেলায় আরো অনেক সভা সমিতি গড়ে ওঠে।[৬৭] এ সকল সংগঠন বিভিন্ন সময় মুসলমান সমাজের সমস্যাবলী সরকারের নিকট উত্থাপনের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রয়াস পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এ সকল সভা-সমিতির কোনটিই যথাযথ অর্থে রাজনৈতিক সংঘ ছিল না। মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে তাঁদের মাঝে আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তারের প্রতিই মূলত এগুলোর মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

১.৫ মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের মাধ্যমে ভারতে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের শুভ সূচনা ঘটে এবং এটিই সর্ব প্রথম আইন যার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয়রা প্রথমবারের মত শাসন ব্যবস্থার সাথে সীমিত আকারে হলেও সম্পৃক্ত হতে সক্ষম হয়। তবে এর ফলে সাধারণ ভারতীয়দের আশা আকাক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। ভারতবর্ষের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ সময় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। পাশ্চাত্য ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভ্যুদয় ঘটে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের আগ্রহ প্রকাশ করে। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বেই ১৮৮৫ সালে I.C.S কর্মকর্তা এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের প্রচেষ্টায় ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দল 'সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতীয়দের দাবি এবং বঞ্চনার বিষয়গুলো আরো জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে পার্লামেন্টে ব্যাপক আলোচনার পর ১৮৯২ সালে সংশোধিত আকারে ১৮৯২ সালের 'ভারতীয় কাউন্সিল আইন (১৮৯২)' পাশ হয়। এ আইনে ভারতবর্ষের আইন পরিষদ সমূহের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিধানাবলি প্রণয়ন করা হয়।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদেরকে এতে যোগদান না করার জন্য আহবান জানান। তিনি রাজনীতি পরিহারে মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি কংগ্রেস বিরোধী প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে অবতীর্ণ হন। স্যার সৈয়দ আহমদ ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার কংগ্রেসের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে একে বাঙ্গালী হিন্দুদের সংগঠনরূপে অভিহিত করেন। তিনি রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের আরও অধিক সুযোগ দানের

এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের প্রতিনিধি নির্বাচন করার কংগ্রেসের দাবিরও বিরোধীতা করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদেরকে সরকারের প্রতি অনুগত থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোনিবেশ করার জন্য পরামর্শ দেন।[৬৮]

কংগ্রেসের প্রতি স্যার সৈয়দ আহমদ খানের দৃষ্টিভঙ্গি বাংলার মুসলমানদেরকেও প্রভাবিত করে। বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের মুখপাত্র 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' এবং 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' কে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এতে যোগদানের আহবান জানানো হলেও উভয় সংগঠনই তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ১৮৮৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের জন্য এর সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'-কে যে আমন্ত্রণ জানান হয়, তার জবাবে সোসাইটির সেক্রেটারী নবাব আবদুল লতিফ বলেন যে, "This committee of the Muhammadan Literary Socity of Calcutta regret their inability to accept your invitation as they do not anticipate any benefit to be derived from further peresent discussion of the difficult and momentous questions likely to occupy the deliberations of the Congress".[৬৯]

'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' এর সেক্রেটারী সৈয়দ আমীর আলী অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন যে, ".....This comittee think that no possible advantage will result either to their community or the country at large by assuming an attitude of uneasiness towards the Governement and the steps it has taken and intends to take....."[৭০]

'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' ও 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' এর এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি যে শুধুমাত্র কংগ্রেস ও এর সমর্থনকারী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সমালোচনার সম্মুখীন

Dhaka University Institutional Repository

হয় তাই নয় মুসলমানদের মধ্য থেকেও কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এ সময় কংগ্রেসের প্রতি সংগঠন দুটির মনোভাবের সমালোচনা করে। বাংলা পাক্ষিক আহ্‌মদী পত্রিকার সম্পাদক আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী মুসলমানদের এরূপ নির্লিপ্ত মনোভাবের সমালোচনা করে বলেন যে, মুসলমানরা কংগ্রেসের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অনুধাবন না করেই এর দ্বারা তাদের স্বার্থহানীর অমূলক আশঙ্কা করছে। তিনি আরও বলেন যে, মুসলমান সমাজের কতিপয় শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কারণে তাদের ঐরূপ আশঙ্কা আরও উদ্দীপ্ত হয়েছে।[৭১]

এ সকল সমালোচনা সত্ত্বেও বাংলার অধিকাংশ মুসলমানদের মনোভাবের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। এ সময় বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেসের বিরোধিতায় উত্তর ভারতের মুসলিম সভা-সমিতি গুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করতে আরম্ভ করেন।[৭২] বাংলার মুসলমানদের বৃহত্তম অংশ কংগ্রেসে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, যা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের দূরত্বকে বাড়িয়ে তোলে। এ সময় কতিপয় কারণে মুসলমানদের কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের নেতৃত্বে বাংলায় হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ এর অভ্যুদয় ঘটলে তাঁদের হিন্দু পুনজার্গরণবাদী চিন্তা কংগ্রেসের হিন্দু সদস্যদেরকেও প্রভাবিত করে এবং অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাও বিবেকানন্দের নিকট পরামর্শ চান।[৭৩] এ পুনর্জাগরণবাদী চেতনা কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে আরও প্রসার লাভ করে যখন মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে উগ্রপন্থী হিন্দুরা শিবাজী ও গনপতি উৎসবের প্রচলন করেন। এসব উৎসব বাংলার হিন্দুদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া জাগায়।[৭৪] বাংলার নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস সদস্য বিপিনচন্দ্র পালও এ সময় বালগঙ্গাধর তিলকের কার্যক্রমকে সমর্থন করেন।[৭৫] হিন্দুদের এরূপ পুনর্জাগরণবাদী মনোভাবের কারণে মুসলমান নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং এ সংগঠনটিকে ভারতীয়

মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য প্রতিষ্ঠান নয় বলে মনে করেন।[৭৬] আর তাই কংগ্রেসে যোগদান করতেও তাঁরা অনীহা প্রকাশ করেন।

এ সময় হিন্দু লেখকদের একাংশ মুসলমানদের ধর্ম, ইতিহাস ও সমাজের প্রতি কটাক্ষ করে সাহিত্য রচনা করলে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের প্রতি মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।[৭৭] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ হিন্দু সাহিত্যিকদের মুসলিম বিদ্বেষী রচনা এ সময় বাংলার মুসলিম মানসকে তীব্রভাবে আঘাত করে। ফলে মুসলমান লেখকরাও হিন্দু সাহিত্যিকদের মুসলিম বিদ্বেষের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এস. এম. আকবর উদ্দীন নামে জনৈক লেখক 'আল-এসলাম'[৭৮] পত্রিকায় 'বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানদের স্থান' শীর্ষক এক ধারাবাহিক প্রবন্ধে হিন্দু সাহিত্যিকদের মুসলিম কুৎসামূলক রচনার সমালোচনা করেন।[৭৯] হিন্দু সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় মুসলমানদের যেরূপ কদর্যভাবে চিত্রিত করেন তার প্রতিবাদে 'নবনূর'[৮০] পত্রিকায় বলা হয় যে, সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সাধারন হিন্দু লেখকরা পর্যন্ত অযথা মুসলিম সমাজের নিন্দাবাদ করেন। আর হিন্দু ঐতিহাসিকরা তাঁদের গ্রন্থে মুসলমান জাতির অপযশ প্রচার করেন। 'নবনূর' সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী এ সকল বিষয়ের প্রতি হিন্দু সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, "ইহাই কি হিন্দু-মুসলমানদের শুভ সম্মিলন সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়?"।[৮১] বস্তুতপক্ষে হিন্দু সাহিত্যিকদের মুসলিম বিদ্বেষী সাহিত্য রচনা হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের আরও সন্দিহান করে তোলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহে চাকুরী লাভের বিষয়কে কেন্দ্র করেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের তুলনায় অগ্রগামী হওয়ায় তারা জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও স্থানীয় পরিষদসমূহে সহজেই প্রাধান্য বিস্তার করে। এ সময় শিক্ষিত হিন্দুরা প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে চাকুরী প্রদান এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে দাবি

Dhaka University Institutional Repository

জানান মুসলমানরা তার তীব্র বিরোধিতা করেন। কারণ তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এর ফলে মুসলমানরা হিন্দুদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়বে।[৮২]

এ সময় হিন্দুরা গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলন[৮৩] আরম্ভ করলে হিন্দু-মুসলমান বৈরী সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এ আন্দোলন হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিকে উজ্জীবিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের জমিদার শশিশেখর গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার জন্য এক প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করেন। কিন্তু কংগ্রেসের উদ্যোক্তাগন এ প্রস্তাবটিকে অসময়োপযোগী বিবেচনা করে বাতিল করেন।[৮৪] এতদসত্ত্বেও এ আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। মুসলিম পত্র-পত্রিকায় হিন্দুদের দ্বারা সূচিত এ আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণে বাধ্য করার প্রচেষ্টাকে অভিযুক্ত করা হয়।[৮৫] এর ফলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, এমন কি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও সংঘটিত হয়।[৮৬] এমতাবস্থায় মুসলমানদের কংগ্রেস বিরোধী অনুভূতি আরও জোরদার হয়। কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের বিরূপ মনোভাবের জন্য এ সময় 'দি মোসলেম ক্রনিকল'[৮৭] পত্রিকাটি হিন্দুদেরকে সরাসরি দোষারোপ করে উল্লেখ করে যে, "... it is the attitude of the Hindus that has kept back the Muslims from joining the Congress."[৮৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের চেতনায় স্বাতন্ত্র্যবোধ দানা বেঁধে ওঠে। এ সময় শিক্ষিত মুসলমান সমাজের বিকাশ ঘটতে শুরু করে এবং চাকুরী প্রত্যাশী শিক্ষিত মুসলমানরা সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের ক্ষেত্রে হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হন। এ প্রতিযোগিতায় তাঁরা হিন্দুদের সমকক্ষতা অর্জন করতে ব্যর্থ হন এবং তাঁদের পশ্চাৎপদতা ও ব্যর্থতার জন্য মুসলমানদের প্রতি সরকারের গৃহীত নীতিকেই দায়ী করেন। বৃটিশ সরকার সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে

মুসলমানদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাধীনে আনলেও ঐ সকল বিষয়ে কখনই কোন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।[৮৯] বৃটিশ সরকারের এ উদাসীন মনোভাবের কারণে মুসলমানদের সরকার প্রীতিতে কিছুটা ভাটা পড়ে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্বই এর দশকের পর থেকেই মুসলমানরা সরকারের মৃদু সমালোচনা করতে আরম্ভ করেন।[৯০]

এ সময় প্যান-ইসলামী আন্দোলনের[৯১] সূত্রপাত ঘটলে ভারতের মুসলমানগণও এর দ্বারা প্রভাবিত হন। এ আন্দোলনের অগ্রদূত জামাল উদ্দীন আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭) মুসলিম বিশ্বে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর আদর্শের অনুকূলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিচালিত প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে ১৮৮২ সালে কলকাতায় আগমন করেন। কিন্তু তাঁর বৃটিশ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ভারতে মুসলিম জাগরণের নেতৃবৃন্দ উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং বাংলার নবাব আবদুল লতিফ কেউই তাঁকে সমর্থন করেননি।[৯২] এতদসত্ত্বেও জামাল উদ্দীন আফগানীর কলকাতা আগমন বাংলার মুসলিম মানসে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় এবং তাঁদের একাংশ প্যান-ইসলামী ভাব ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।[৯৩] এ সময় সরকারের প্রতি মুসলমানদের অসন্তুষ্টিও বৃদ্ধি পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের মধ্যে অনেকে ভারতের মুসলমান ও তুরস্কের প্রতি বৃটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। অন্যদিকে কেউ কেউ আবার মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অগ্রগতির অভাব লক্ষ্য করে উদ্বেগও প্রকাশ করেন। এরূপ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটানোর জন্য বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেসের বিপরীতে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলোও স্বধর্মীদের এরূপ মনোভাবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে।[৯৪] কিন্তু এ বিষয়ে বাংলার মুসলমানরা তেমন একটা অগ্রগতি লাভ করতে পারেননি। কারণ ১৮৯০ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হওয়ার পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালে এবং ১৮৯৩ সালে নবাব আবদুল লতিফের মৃত্যুর পর বাংলার মুসলিম নেতৃত্বে শূণ্যতা সৃষ্টি হয়।[৯৫] এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার মুসলমানরা উত্তর ভারতের মুসলমান নেতৃবৃন্দের দ্বারা ব্যাপকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবিত হন। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় 'মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এর যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই বাংলার মুসলমানরা উত্তর ভারতের মুসলমানদের কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।[৯৬]

১.৬ বঙ্গভঙ্গ ও মুসলিম লীগ গঠনের প্রেক্ষাপট

ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। প্রায় দুই লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের এ বিশাল প্রদেশের প্রশাসনিক কার্যক্রমের সুবিধার্থে ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করেন যা 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত। প্রধানত শাসনতান্ত্রিক কারণে বঙ্গভঙ্গ করা হলেও এর পিছনে বিবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। যেমন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ব্রিটিশদের 'ভাগ কর শাসন কর নীতি' (Divide and Rule Policy)।

বাংলা তখন ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রদেশ ছিল। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এর আয়তন ১,৭৯,০০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৭,৯০,০০,০০০ ছিল। এই বিশাল প্রদেশ একজন ছোটলাটের শাসনাধীন ছিল এবং যাতায়াতের ভাল সুবিধা না থাকায় ছোটলাট প্রদেশের পূর্বাঞ্চল দেখাশুনা করতে পারতেন না।[৯৭] শাসনকার্যের সুবিধার্থে ব্রিটিশ সরকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বিভক্ত করার কথা চিন্তা করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার এবং স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনও বহুবার বিষয়টি আলোচনা করেন। এরপর ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। সৃষ্টি হয় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও আসামকে নিয়ে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ এবং এর রাজধানী হয় ঢাকা।[৯৮] বঙ্গভঙ্গের পর 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের আয়তন ১,০৬,৫০৪ বর্গমাইল ও এর

লোকসংখ্যা প্রায় ৩,১০,০০,০০০ ছিল। এর অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় ১,৮০,০০,০০০ মুসলমান ও ১,২০,০০,০০০ হিন্দু ছিল।[৯৯]

১৯০৫ সালের বাংলা বিভাগ এবং নতুন প্রদেশ সৃষ্টি পূর্ব বাংলার মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজে প্রাণের সঞ্চার করে। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকায়। অনেক কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজধানী ঢাকা ভিত্তিক হওয়া শুরু করে। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে এর লেফটেন্যান্ট গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। ক্রমান্বয়ে বাংলার জনসাধারণের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটে। কিন্তু বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ করে বর্ণ হিন্দুগণ বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধীতা শুরু করেন। তাদের কাছে বাংলার বিভক্তি ছিল 'মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ' (Dissection of the Motherland)-এর সমান। তাই তারা কিছুতেই বঙ্গভঙ্গকে মেনে নিতে পারেননি। তাদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দ্রুত বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি সর্বাত্মক আন্দোলনে রূপ নেয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সুসংগঠিত ও শক্তিশালী আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠনের আবশ্যকতা তুলে ধরে।[১০০]

এ সময় মুসলমানরা নিজেদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে আরো বেশী সচেতন হয়ে ওঠেন। পূর্ববাংলায় মুসলিম জনমত গঠনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন নবাব সলীমুল্লাহ। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর তাঁর প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সংঘের পরিকল্পনা নিয়ে একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাত করে সর্বপ্রকার নির্বাচনী ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে তাদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবি জানান।[১০১] ভাইসরয় মুসলমানদের এ দাবির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলে তাঁরা একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আরো উৎসাহিত হন এবং ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ঢাকা শহরে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন।[১০২] বাংলা ও ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক বিবর্তনে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা। এর ফলে মুসলমানরা স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তা প্রকাশের একটি প্ল্যাটফর্ম লাভ করেন।

তথ্যনির্দেশ

১। অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ২৬-৩১।

২। আবদুল মুমিন চৌধুরী, বঙ্গ, বাংলাপিডিয়া, খন্ড ৮, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা) ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১১ (২য় সংস্করণ), পৃঃ ২৪৬-২৪৭।

৩। শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙলা ও বাঙালী, পাটনা, ১৯৯০, পৃঃ ২।

৪। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ১২০।

৫। ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য (সম্পা), বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, নতুন সংস্করণ, ২০০৬, পৃঃ ১৮-১৯ ।

৬। মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য (সম্পা.) আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃঃ XVI-XVII.

৭। এম.এ.সাঈদ, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, ঢাকা, ২০১৪, পৃঃ ০৩ ।

৮। প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, শুভেচ্ছা প্রেস এন্ড পাবলিকশেন, ঢাকা-২০১৫, পৃঃ ০৩ ।

৯। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃঃ ৩৯ ।

১০। অতুল সুর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬-৩২, বিস্তারিত আব্দুল করিম, বঙ্গ : বাঙ্গালা : বাংলাদেশ, মানববিদ্যা বক্তৃতা, ঢাকা, ১৯৮৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

১১। ডঃ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য (4 Doctors), বাংলাদেশের ইতিহাস, নবম সংস্করণ, ২০০১, পৃঃ ৫৭।

১২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৩।

১৩। R.C. Majumdar, The History of Bengal, Vol.1, Dacca University, 1943, P: 23.

১৪। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খন্ড, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ১৭।

১৫। N.K. Bhattasali, Coins and Chronalogy of the Early Independent Sultans of Bengal, Dhaka, 1990, P: 144.

১৬। আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯২।

১৭। M.R. Tarafder, Hussain Shahi Bengal, Dhaka, 1991, P: 47.

১৮। এম.এ. সাঈদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪।

১৯। মোঃ মোজাম্মেল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

২০। S.C. Hill, Bengal in 1956-1957, Vol-1, London, 1905, P: 239-240.

২১। মোঃ মোজাম্মেল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০-১১ ।

২২। হোসেন উদ্দীন হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭২ ।

২৩। G.B. Malleson, The Decisive Baltle of India, London, 1894, P: 90.

২৪। C.R.Dutta, The Economic History of British India Under Early British Rule, Calcutta, 1969, P: 23.

২৫। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১।

২৬। মো: মোজাম্মেল হক, পূর্বোক্ত, পৃ: ১২।

২৭। ড. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃ: ৪৪৫।

২৮। G.P. Malleson , Lord Clive Rulers of India Series, Oxford, 1895, P: 123-124.

২৯। মোহাম্মদ গোলাম রসুল, বাংলাদেশ ও পাক ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড, ১৯৯২, পৃ: ৩৬।

৩০। আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮), তৃতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ: ৫০-৫৩।

৩১। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭০, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯০, পৃ: ২৯৮।

৩২। পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬৩, ২৯৯।

৩৩। আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪১।

৩৪। বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০, পৃ: ৩৩।

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), প্রথম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ: ২৭৬।

৩৭। Jayanti Maitra, Muslim Politics in Bengal (1855-1906), Collaboration and Confrontation, First Published, Calcutta, 1984, P: 74.

৩৮। W.C. Smith, Modern Islam in India, A Social Analysis, Reprinted, New Delhi, 1979, P: 7.

৩৯। সৈয়দ আহমদ খানের সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্যঃ S.M Ikram, Modern Muslim India and The Birth of Pakistan, Second Edition, Revised and Enlarged, Lahore, 1965, P: 15-66।

৪০। আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮২।

৪১। Enamul Haque, Nawab Bahadur Abdul Latif, His Writings & Related Documents, Samudra Prokashani, Dacca, 1968, P: 164-165.

৪২। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ: ১০৫।

৪৩। Enamul Haque, op. cit., P: 166-167.

৪৪। Abdus Subhan, Nawab Abdul Latif, Father of Muslim Awakening in Bengal, Journal of the Asiatic Society Bangladesh, Vol.35, 1990, P: 42.

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। Nawab Abdul Latif Khan Bahadur, A Short Account of my Public Life, Calcutta, 1885, Reprinted in Enamul Haque, op. cit., P: 167-168.

৪৬। আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৫।

৪৭। Enamul Haque, op. cit., P: 79.

৪৮। Ibid., P: 148-149.

৪৯। Enamul Haque, op. cit., P: 175.

৫০। ওয়াকিল আহমদ, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৬।

৫১। Sufia Ahmed, Muslim Community in Bengal (1884-1912), First Published, Dacca, 1974, P: 172.

৫২। Ernest, H. Griffin, Memories of The Late RT. Hon'ble Syed Ameer Ali, Islamic Culture: The Hydrabad Quarterly Review, 1931-1932., P: 9.

৫৩। কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৫২৬।

৫৪। Sufia Ahmed, op. cit., P: 177.

৫৫। আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬০।

৫৬। Sufia Ahmed, op. cit., P: 178।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭। Anil Seal, The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the Later Ninteenth Century, Cambridge, 1968, P: 312.

৫৮। Sufia Ahmed, op. cit., P: 179.

৫৯। A.K Nazmul Karim, The Dynamic of Bangladesh Society, Vikas, New Delhi, 1980, P: 214.

৬০। Memories of Ameer Ali, op. cit., P: 9.

৬১। সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯০।

৬২। Sufia Ahmed, op. cit., P: 180।

৬৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯০।

৬৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯১।

৬৫। Sufia Ahmed, op. cit., P: 181-182.

৬৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৩।

৬৭। Sufia Ahmed, op. cit., P: 183.

৬৮। Ibid., P: 185-186.

৬৯। Ibid., P: 187.

৭০। Ibid.

৭১। Ibid., P: 190.

Dhaka University Institutional Repository

৭২। ১৮৮৮ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খান কংগ্রেসের বিরোধিতা করা এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করার লক্ষ্যে 'ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করলে বাংলার বিভিন্ন সংগঠনও এর কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়। বাংলা থেকে নিম্নলিখিত সংগঠনগুলি 'ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' এর অধিভূক্ত হয়ঃ (১) সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন, কলকাতা, (২) ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন, মেদিনীপুর শাখা, (৩) আঞ্জুমান-ই-ইসলামীয়া, ময়মনসিংহ, (৪) আঞ্জুমান-ই-ইসলামীয়া, রংপুর শাখা, (৫) ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন, পাবনা শাখা। সূত্রঃ Sufia Ahmed, op. cit., P: 205, F.N.1.

৭৩। Ibid., P: 192, F.N.2.

৭৪। কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৩৬-৩৭।

৭৫। Sufia Ahmed, op. cit., P: 212.

৭৬। Ibid., P: 213.

৭৭। কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৭।

৭৮। 'আল-এসলাম' পত্রিকাটি ১৯১৫ সালের ৩রা মে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ আকরাম খান। এটি একটি মাসিক পত্রিকা ছিল। সূত্রঃ আনিসুজ্জামান, সাময়িক পত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৬।

৭৯। কাজী আবদুর মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮৭।

৮০। 'নবনূর' পত্রিকাটি সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায় ১৯০৩ সালের ১৫ই মে কলকাতা থেকে মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হয়। সূত্র আনিসুজ্জামান, সাময়িক পত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬।

৮১। অমলেন্দু দে, বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ: ২২০, কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪৯।

৮২। Sufia Ahmed, op. cit., P: 195-196.

৮৩। আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮২।

৮৪। Sufia Ahmed, op. cit., P: 199.

৮৫। Ibid., P: 200.

৮৬। বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩২।

৮৭। ইমরান হোসেন, বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী চিন্তা ও কর্ম (১৯০৫-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ: ৮৩।

৮৮। The Moslem Chronicle, 3 August, 1901.

৮৯। Sufia Ahmed, op. cit., P: 202.

৯০। W.C. Smith, Modern Islam in India, A Social Analysis, Reprinted, New Delhi, 1979, P: 202-203.

৯১। Ibid., P: 33.

৯২। এ. কে. এম. ইদ্রিস আলী, উসমানীয় খিলাফত ও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বত্রিশ বর্ষ, ১ম - ৩য় সংখ্যা, ১৪০৫, পৃ: ৯।

৯৩। মুস্তফা নূরউল ইসলাম, মুসলিম বাংলা সাহিত্য পাঠ পরিক্রমা, প্রথম প্রকাশ, রাজশাহী, ১৯৬৮, পৃ: ০৯।

৯৪। Sufia Ahmed, op. cit., P: 206.

৯৫। Ibid., P: 207.

৯৬। Ibid., P: 214.

৯৭। Dr. A.R. Mallik, The Muslims and the Partition of Bengal, Pakistan History Association, Karachi, 1905, P: 2.

৯৮। হারুন-অর-রশীদ, বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষঃ পিছন ফিরে দেখা, ইতিহাস, উনচল্লিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ২০০৬ পৃঃ ১৯।

৯৯। এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), চতুর্থ প্রকাশ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৬৭।

১০০। Harun-or-Rashid, The Foreshadowing of Bangladesh; Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947, Asiatic Society of Bangladesh, The University Press Limited, Dhaka, 2003, P: 6.

১০১। এ. আর. দেশাই, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, ভাষান্তর মনস্বিতা সান্যাল, কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম অনুবাদ সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃঃ ৩৪৬।

১০২। শেখর বন্দোপাধ্যায়, পলাশী থেকে পার্টিশান; আধুনিক ভারতের ইতিহাস, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৬, পৃঃ ১২৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা এবং এর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও নীতি নির্ধারণ (১৯০৬-১৯১২)

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন কারণে এতে মুসলমানদের স্বার্থ অবহেলিত হতে থাকে। নতুন দল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানরা নিজেদের দাবি-দাওয়া উপস্থাপন এবং রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

২.১ সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

ড: হারুন-অর-রশীদ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "The foundation of the All India Muslim League (AIML) in 1906 in Dhaka was a landmark in Muslims politics in India as well as in Bengal. Although for three decades from its inception the League remained an elitist body, it was the first attempt to organize an All India Muslim political community. Except for certain years a provincial League was in existence in Bengal throughout the period. The following is an attempt to make a brief study of the nature and activity of the Bengal Muslim League".[১]

মুসলমানরা ছিল ভারতের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশের বেশি। ভারতের মোট জনসংখ্যা ২৯ কোটি ৪০ লাখের মধ্যে মুসলমান ছিল ৬ কোটি ২০ লাখ। অথচ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের দায়ভার মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের প্রতি ব্রিটিশ সরকার কঠোর নীতি অবলম্বন করে। এছাড়া 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (১৭৯৩)[২] এর কারণে তৎকালীন মুসলিম সমাজ চরম দূরাবস্থায় পতিত হয়। ১৮৯৩ সালের নির্বাচনে রাজকীয় পরিষদের বেসরকারী সদস্যদের শতকরা ৪৫ ভাগ সদস্য ছিলেন হিন্দু মধ্যবিত্ত। মুসলমানরা ভারতের জনসংখ্যার ২৩ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও তাদের দেয়া হয়েছে শতকরা ১২ ভাগ আসন। বাংলা প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলমানরা ৬ ভাগ আসন পায়। চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা ছিল আরো করুন। প্রশাসনের কার্যনির্বাহী ও বিচার বিভাগের অধঃস্তন পদে ১৮৫৭ সালে মুসলমানদের সংখ্যা ৬৩.৯% হলেও ১৮৮৬-১৮৮৭ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৪৫.১%। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় তাঁদের এই পশ্চাৎপদতা দূর করতে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ও নিজেদের রাজনৈতিক ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ক্রমান্বয়ে একটি দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আর এর সফল পরিণতিই ছিল ১৯০৬ সালে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা '।[৩]

বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে নবাব সলীমুল্লাহ পূর্ববাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনে প্রধান নেতার আসন লাভ করেন। ১৮৭১ সালে ঢাকার নবাব পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। নবাব সলীমুল্লাহ সমাজদরদীরূপে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময় তিনি পূর্ববাংলার মুসলমানদের নেতৃত্বের ভূমিকায় এগিয়ে আসেন। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' গঠনের ব্যাপারে তিনি লর্ড কার্জনের সাথে সহযোগীতা করেন।[৪]

নবগঠিত প্রদেশের উন্নতির জন্য নবাব সলীমুল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই বিষয়ে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য মুসলমান নেতাগণ তাঁকে সমর্থন করেন। রাজশাহীর মুহাম্মদ ইউসুফ, কুমিল্লার নওয়াব আলী চৌধুরী, শ্রীহট্টের মুহাম্মদ এহিয়া, ময়মনসিংহের আব্দুল হাই আখতার, বগুড়ার খোন্দকার হাফিজ

উদ্দীন, ধনবাড়ীর নওয়াব আলী চৌধুরী ও বরিশালের এ.কে. ফজলুল হক তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সহচর ছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারেন যে, নবগঠিত প্রদেশের মুসলমানদের সংহতি ও উন্নতি বিধানের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক। এই প্রতিষ্ঠানের মূখ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর উদ্যোক্তাগণ বলেন যে, এটি নতুন প্রদেশের মুসলমানদের সংহতি রক্ষা করে জনসাধারণের সর্ববিধ কল্যাণের ব্যবস্থা করবে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া হয় 'প্রাদেশিক মুসলিম সংঘ' (Provincial Muhammedan Union)। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ঢাকায় নর্থব্রুক হলে এক সভায় প্রাদেশিক মুসলিম সংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইদিন থেকেই বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয় ও নতুন প্রদেশের শাসনকার্য শুরু হয়। নবাব সলীমুল্লাহ এ সংঘের পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হন।[৫]

নবাব সলীমুল্লাহ প্রাদেশিক মুসলিম সংঘের উদ্বোধনী সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। তিনি তাঁর অভিভাষণে নতুন প্রদেশে মুসলমানদের যেসব ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা আছে সে বিষয়ে আভাস দেন। এসময় মুন্সিগঞ্জে এক জনসভায় তিনি বলেন যে, "বঙ্গভঙ্গ আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় জীবন হইতে জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং সক্রিয় জীবন ও সংগ্রামের পথে ধাবিত করিয়াছে"।[৬] প্রাদেশিক মুসলিম সংঘের উদ্যোক্তাগণ মনে করেন যে, তাঁদের প্রতিষ্ঠান বাংলার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছে।[৭]

পূর্ববঙ্গ ও আসামের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য শুধু প্রাদেশিক মুসলিম সংঘ গঠন করেই নবাব সলীমুল্লাহ থেমে থাকেননি। তিনি ভারতে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং সে উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেসময় কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারও তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করার নীতি অনুসরণ করেছিল। নবাব সলীমুল্লাহ বুঝতে পারেন যে, ব্রিটিশ সরকারের উপর শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব প্রতিহত করতে হলে ভারতীয় মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা রচনা

করেন।[৮] উল্লেখ্য যে, এর আগেও ১৯০১ সালের অক্টোবর মাসে নবাব ওয়াকার-উল-মূলক ও আরো কয়েকজন মুসলমান নেতা লক্ষ্মৌতে এক ঘরোয়া বৈঠকে মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। এরপর ১৯০৩ সালে শাহ্‌রানপুরে একটি মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাঞ্জাবে ফজল-ই-হোসেনও একটি রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নাম রাখেন 'মুসলিম লীগ'।[৯]

এ সময় ভারত সচিব লর্ড মর্লি পার্লামেন্টে আভাস দেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করছে। এর ফলে মুসলমান নেতাগণ সক্রিয় হয়ে উঠেন। নতুন শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তারা বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে এক প্রতিনিধি দল পাঠানোর আয়োজন করেন। প্রতিনিধি দল প্রথমে ১৯০৬ সালের ১৬ ই সেপ্টেম্বর লক্ষ্মৌতে এক আলোচনায় মিলিত হন। স্যার আব্দুর রহিম এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এখানে মুসলমানদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে স্মারকলিপির খসড়া প্রস্তুত করা হয়। বৈঠকে তাঁরা মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে যে আলোচনা করেন তা ১৯০৬ সালের আগষ্ট ও নভেম্বর মাসে সৈয়দ আমীর আলীর দুইটি প্রবন্ধে 'নাইনটিনথ সেঞ্চুরী' নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১০]

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর মুসলমানদের প্রতিনিধি দলটি গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাত করেন। মুসলিম প্রতিনিধি দলে আলীগড়পন্থীদের পাশাপাশি আগাখানের মত আলীগড় বিদ্বেষীরাও ছিলেন। মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপারে তাঁরা সবাই ঐক্যমত্য প্রকাশ করেছিলেন। আগা খান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ১৯০৬ সালের মধ্যে অন্যান্য মুসলমান নেতৃবর্গের সঙ্গে আমি এবং মহসীন-উল-মূলক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, স্বশাসিত কোনো নতুন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন পথ অনুসরণের উপর আমাদের ভাগ্য নির্ভর করছে। আর ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ পৃথক একটি জাতি হিসেবে আমাদের রাজনৈতিক

স্বীকৃতি লাভ ছাড়া গত্যন্তর নেই।[১১] আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট মুসলমানদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে লর্ড মিন্টোর বৈঠকটি 'সিমলা ডেপুটেশন' (Simla Deputation) নামে পরিচিত।[১২] উক্ত বৈঠকে যে সকল দাবি দাওয়া পেশ করা হয় তা এখানে উল্লেখ করা হলো:

১। সামরিক, বেসামরিক এবং বিচার বিভাগে মুসলমানদের যথেষ্ট সংখ্যায় নিয়োগ প্রদান করতে হবে এবং কোন প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা উচ্চতর পদগুলো লাভে বাঁধা হবে না।

২। পৌরসভা, জেলা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত করতে হবে।

৩। জনসংখ্যার অনুপাত নয় বরং তাদের রাজনৈতিক গুরুত্বের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক কাউন্সিলে মুসলমানদের নির্বাচন করতে হবে।

৪। মুসলমানগণ যাতে গুরুত্বহীন সংখ্যালঘুতে পরিণত না হয় সেজন্য পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যথেষ্ট সংখ্যায় মুসলমানদের নির্বাচনের রক্ষাকবচ রাখতে হবে।

৫। একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেটি হবে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের গর্ব।

লর্ড মিন্টো আসন্ন শাসন সংস্কারে মুসলমানদের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দেন। বঙ্গভঙ্গ রদ করা হবে না লর্ড মিন্টোর কাছ থেকে এরকম আশ্বাস পেয়ে মুসলমান নেতারা খুশি হন। তবে মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং হাইকোর্ট গুলোতে নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে ভাইসরয় মিন্টো নীরব থাকায় তরুন মুসলমান নেতারা আহত হন।[১৩] এ কারণে সিমলায় সমবেত নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারেন যে, শুধু এককভাবে বড়লাটের কাছে দাবি পেশ করাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠনের, যার মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা চালানো সম্ভব। এখানে স্থির হয় যে, কয়েক মাস

পর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সভায় একটি রাজনৈতিক দলগঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। [১৪]

চোখে অস্ত্রোপচার হওয়ার কারণে নবাব সলীমুল্লাহ ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর নিকট প্রেরিত প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর রাজনৈতিক সহচর নওয়াব আলী চৌধুরী এবং এ.কে.ফজলুল হক প্রতিনিধি দলে যোগ দেন। এই প্রতিনিধি দলের নেতাদের সাথে আলোচনার জন্য নবাব সলীমুল্লাহ নওয়াব আলী চৌধুরীর কাছে তাঁর প্রস্তাবিত মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার খসড়া পাঠিয়েছিলেন। সিমলায় ঘরোয়া বৈঠকে প্রতিনিধি দলের সভ্যগণ তাঁর প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং ডিসেম্বরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[১৫]

এরপর নভেম্বর মাসে নবাব সলীমুল্লাহ তাঁর পরিকল্পনা সম্বলিত চিঠি মুসলমান নেতাদের কাছে পাঠান। নবাব সলীমুল্লাহর চিঠির বিষয় উল্লেখ করে মাওলানা মুহাম্মদ আলী লিখেছেন, "১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন অধিবেশনে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের ঢাকায় মিলিত হওয়ার কথা ছিল। এই সুযোগ গ্রহণ করে ঢাকার নবাব সলীমুল্লাহ বাহাদুর মুসলমান নেতাদের তাঁর রাজনৈতিক সংঘের পরিকল্পনার খসড়া প্রেরণ করেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের অভিমত জানতে চান। তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার আলোচনা সভায় তাঁরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন, লিখিতভাবেও তাঁরা তাঁদের অভিমত জানাতে পারেন। নবাব সলীমুল্লাহ চিঠির আশ্চর্যজনক সাড়া পেয়েছিলেন। কেউ কেউ পরিকল্পনার কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং কেউ কেউ জানিয়েছিলেন যে, ঢাকায় আলোচনার পর পরিকল্পনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে। দূরবর্তী স্থান থেকে কয়েকশত মুসলমান ঢাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ থেকে কয়েক হাজার প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন"।[১৬] প্রসঙ্গক্রমে এখানে নবাব

সলীমুল্লাহর পরিকল্পনা সম্বলিত পত্রটি উপস্থাপন করা হলো। নবাব সলীমুল্লাহ তাঁর পরিকল্পনা সম্বলিত পত্রে (Circular Letter) লিখেছিলেন:

১। আজ আমাদের সদাশয় সম্রাটের জন্মদিন। এই শুভদিনে আমি আমার মুসলমান ভ্রাতাদের নিকট আমার পরিকল্পিত সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘের (Muhammedans All India Confederacy) বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করিতেছি।

২। সিমলায় মহামান্য বড়লাটের নিকট প্রেরিত সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধি দলে যোগ দিতে অসমর্থ হওয়ায় আমি আমার বন্ধু প্রতিনিধিদেরকে লিখিতভাবে আমার পরিকল্পনার বিষয় জানাইয়াছিলাম। আমি লিখিয়াছিলাম যে, সমগ্র ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্খা রূপায়িত করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় মুসলিম প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

৩। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার পরিকল্পনার বিষয় নিয়া প্রতিনিধিগণ ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া তাহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে, ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।[১৭]

৪। সিমলায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার পরিকল্পনার পূর্ণ খসড়া আমাদের দেশের বিভিন্ন সংস্থা, সম্প্রদায়ের গন্যমান্য ব্যক্তি ও সংবাদ প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করি এবং পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সকলের ন্যায়-সঙ্গত আলোচনা আহবান করি। আমি অনুরোধ করি যেন বিভিন্ন সংস্থা ও প্রদেশের প্রতিনিধিগন পরিকল্পনার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ ক্ষমতা লইয়া ঢাকার সম্মেলনে যোগদান করেন। তাহা হইলে আলোচনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হইতে পারিবে।

৫। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার পরিকল্পনা নিয়া সিমলায় যে আলোচনা হয় তাহাতে অধিকাংশ প্রতিনিধি মুসলমানদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুকূলে মত

দিয়াছেন, কিন্তু আমি ইচ্ছা করি যে, সংখ্যালঘুদের মতামতও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, যাহাতে বিস্তৃত আলোচনা বিশেষে কিছু মতানৈক্য থাকিলেও তাহা মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের খাতিরে সকলের গ্রহণযোগ্য হইবে।

৬। কেহ কেহ মনে করেন যে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নাই , কারণ ইহাতে স্থানীয় সংস্থাগুলি দুর্বল হইয়া পড়িবে। তাহাদের মতে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে স্থানীয় সংস্থা গঠনের উপর জোর দেওয়া উচিত। আবার কেহ কেহ ভয় করেন যে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে ইহা আলীগড়ের মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে। কারণ ইহার প্রতিষ্ঠাতা ইহাকে সব রকম রাজনীতি হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন।[১৮]

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হইলে আলীগড় শিক্ষাকেন্দ্রের উপকারিতা ও কার্যকারীতা অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং প্রতি প্রদেশে ইহার মত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হইবে। রাজনীতি সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, যদি আমরা জীবনের প্রতিযোগীতায় পিছনে পড়িয়া না থাকিতে চাই তাহা হইলে আমাদেরকে যুগের সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে হইবে। পঁচিশ বৎসর হইল আলীগড় কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার সামর্থ ও উপকারিতা বজায় রাখিতে হইলে আমাদেরকে আমাদের দেশ ও জাতির রাজনৈতিক জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করিতে হইবে। আমি আশা করি যে, আমাদের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আমার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও অন্যান্যের প্রদত্ত পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যাহাতে পরিপূর্ণ আলোচনার পর আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি যাহার দ্বারা আমাদের সম্প্রদায়ের কল্যাণের পথ সুগম হইবে।

৭। অনেকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বড়লাটের নিকট আমাদের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি দল যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছিল, "ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়; তাহাদের নিজস্ব অতিরিক্ত স্বার্থ আছে, এই স্বার্থের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নাই

এবং উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকায় এই স্বার্থগুলি অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান না থাকিলে আমাদের সম্প্রদায়ের এই বিশেষ স্বার্থগুলি রক্ষা করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিলে এই বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করা, পরামর্শ করা ও পরামর্শ দেওয়ার সুবিধা হয়। এই প্রসঙ্গে আমি টাইমস অব ইন্ডিয়ার মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। বড়লাটের নিকট মুসলমান প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার এক প্রবন্ধে লিখা হইয়াছে "ইহার (এই সাক্ষাতের) ফলে মুসলমানদের ভাবধারায় যে ঐক্য দেখা গিয়াছে তাহাতে অবস্থা অনুযায়ী তাঁহারা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে পারিবে। স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, এই বিশেষ স্বার্থগুলির সহিত অন্য সম্প্রাদয়ের কোন সম্পর্ক নাই।" আমাদের সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিগন টাইমস অব ইন্ডিয়ার সহিত এই বিষয়ে একমত যে, বহু সংখ্যক মুসলিম সংস্থার অস্তিত্ব থাকা বশত সরকারের কর্তৃপক্ষ মুসলমান সম্প্রদায়ের সঠিক মতামত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন এবং আমাদের যুবকেরা মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে বলিতে গিয়া অনেক সময় পরস্পর বিরোধী অভিমত ব্যক্ত করিয়া ফেলে। রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কোন কোন দায়িত্বহীন মুসলমান ও সংস্থা তাহাদের কার্যকলাপের দ্বারা অনেক বিষয়ে মুসলমান সমাজের ক্ষতি করিয়াছে। তাহারা জনসাধারণের নেতারূপে সরকারের নিকট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে। কিন্তু কেহই তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নাই। এই কারণে তাহাদের বক্তব্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আবার যদিও বা কর্তৃপক্ষ তাহাদের অভিমত গ্রহণ করে ইহা মুসলমান জনসাধারণের সমর্থনযোগ্য হয় না। ফলে ইহা মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকর হয়। এই অবস্থায় যদি আমরা একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করি তাহা হইলে সরকার প্রয়োজন মত আমাদের সম্প্রদায়ের অভিমত জানিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং স্বার্থান্বেষী দলের হাতে মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

৮। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন। আমাদের অনেকে হয়ত এই ব্যাপারে আমার সহিত একমত হইবে না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, প্রতিষ্ঠানকে কার্যকরী ও শক্তিশালী করিতে হইলে প্রথমে ইহার নীতি ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে সম্ভবত সরকারের বিধিব্যবস্থা সমর্থন করা এবং সারাদেশে আমাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য কাজ করা।

৯। কি প্রকারে ইহা করা হইবে তাহা বর্ণনা করিতেছি: আমরা যে প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা ভাবিতেছি তাহার উপযুক্ত নামকরণ খুবই দরকার। অনেক বিবেচনার পর আমি মনে করিয়াছি যে, ইহার জন্য 'মুসলমানদের সর্বভারতীয় সংঘ' (The Muhammedan All India Confederacy) নাম উপযোগী হইবে কারণ এই প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের সকল সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্থা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মুখপাত্রের কাজ করিবে এবং সকলকে আমাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও উন্নতির জন্য সংঘবদ্ধ করিবে। ইহার উদ্দেশ্যঃ-

ক) তথাকথিত জাতীয় কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিহত করা। কংগ্রেস ভারতে বৃটিশ শাসন হেয় ও খর্ব করিতে প্রয়াস পাইতেছে এবং ইহার ফলে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে।

খ) আমাদের সম্প্রদায়ের যেসব যুবক আমাদের মধ্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না থাকায় কংগ্রেসে যোগ দিয়াছে, প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে তাঁহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা ও পরিচয় দিতে সুযোগ পাইবে।

১০। সিমলায় যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা হইতে বুঝা যায় যে, কেহ কেহ আমাদের উদ্দেশ্য এরূপ খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করার পক্ষপাতী নহেন; তাঁহারা মনে করেন যে, ইহাতে আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু আমাদের এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, এখন আমাদেরকে ভাবাবেগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবেনা। এই ভাবাবেগের দরুন এখন আমাদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া ধ্বংস ও দূর্দশার সূত্রপাত হইয়াছে। চরমপন্থীদের কার্যকলাপ ব্রিটিশ শাসনের অনুকূলে কিনা সে বিষয়ে

আমাদের মুসলমানদেরকে বিশ্বস্ততার সহিত আলোচনা করিতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। চরমপন্থী দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি অংশ। এই অবস্থায় যদি কংগ্রেস প্রকাশ্য সভায় চরমপন্থীদের মতামতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ না করে, তাহা হইলে মুসলমানগণ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে না। আমরা দুঃখিত, কিন্তু আমরা অস্বীকার করিতে পারিনা যে, দেশের ব্যাপারে তথাকথিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতামতকে মূল্য দেওয়া হইতেছে। ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত প্রজারূপে আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ যাহাতে আমরা কংগ্রেসের প্রভাব রোধ করিতে পারি, কারণ ইহার প্রভাবের দরুণ আমাদের সকল প্রিয় বস্তু নষ্ট হইতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমাদের শিক্ষিত মুসলমান যুবকেরা কংগ্রেসে যোগ না দিলে অথবা অন্ততপক্ষে ইহাকে সমর্থন না করিলে চাকরি পাইতে ও চাকরিতে উন্নতি করিতে পারে না। আমাদের মুসলমানদের সংবাদপত্রে প্রায়ই অভিযোগ দেখিতে পাই যে, আজকাল ডিগ্রীধারী মুসলমান যুবকের অভাব নাই। কিন্তু তাহাদেরকে চাকরিতে নিয়োগ করা হয় না এবং ইহার কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, সরকারের নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী তাহাদের যোগ্যতা নাই। (বড়লাটের নিকট স্মারকলিপিতে এই তথ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে)। আমাদের প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের কর্মসংসদ সকল স্থানীয় সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবে এবং আমাদের মেধাবী যুবকদের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে; জীবনের উন্নতির জন্য তাহাদের আর কংগ্রেসের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না।[১৯]

নবাব সলীমুল্লাহর সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘের পরিকল্পনা কংগ্রেসের মুখপত্র ‘দি বেঙ্গলী’ সংবাদপত্রে ১৯০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে এই পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং আশা করা হয় যে, মুসলমানরা এ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে না। মন্তব্য করা হয় যে, ”মুসলমানদের সর্বভারতীয় সংঘের পরিকল্পনা আমাদেরকে মারাঠা সংঘ ও খালসা সংঘের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন তোষামোদের

দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন এই প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র তখন নবাব কি জন্য ইহার এরূপ যুদ্ধংদেহি নাম রাখিয়াছেন"।[২০]

'টাইমস অব ইন্ডিয়া' মুসলমানদের ঐক্যের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে; কিন্তু এটি নবাবের পরিকল্পনাকে অপরিনামদর্শীতার পরিচায়ক বলে মত প্রকাশ করে। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'দি পাইওনিয়ার' (১৪ ডিসেম্বর, ১৯০৬) এর সমালোচনায় বলে যে, মুসলমানদের মতামত প্রকাশের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। 'দি ইংলিশম্যান' (২০শে ডিসেম্বর ১৯০৬) নবাব সলীমুল্লাহর পরিকল্পনাকে সমর্থন করে।[২১]

নবাব সলীমুল্লাহর সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক সংঘ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গের বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সমর্থন লাভ করা। এই সময় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও হিন্দুদের তীব্র আন্দোলন চলছিল এবং বঙ্গভঙ্গ বজায় রাখার জন্য পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মুসলমান নেতাগণ ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সহযোগীতা লাভের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তাছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের সামগ্রিক স্বার্থ ও উন্নতির জন্য তাঁরা এমন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে নবাব সলীমুল্লাহ মুসলমান নেতাদের কাছে তাঁর পরিকল্পনা জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন এবং তাঁদেরকে ঢাকায় আমন্ত্রণ করেছিলেন। মাদ্রাজের রফিউদ্দীন নামক একজন প্রতিনিধি ঢাকা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।[২২] তিনি 'দি ইংলিশম্যান' পত্রিকার প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন যে, নবাব সলীমুল্লাহ সর্বভারতীয় মুসলমানদের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার আলোচনার ব্যবস্থা করে মুসলমান সম্প্রদায়ের বড় উপকার করেছেন। এ আলোচনার ফলে অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়েছে। এ নতুন প্রদেশের মুসলমানদের আশা আকাঙ্খা সম্পর্কে সবাই জানতে পেরেছে এবং মুসলমান সম্প্রদায় ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে সচেতন হতে পেরেছে।[২৩]

১৯০৬ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টার সময় নবাব সলীমুল্লাহর শাহবাগ নামক সুরম্য বাগানে অধিবেশন শুরু হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং সোমালিল্যান্ড, নেটাল প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান থেকে আগত প্রায় আট হাজার প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন।[২৪] নবাব সলীমুল্লাহ অভ্যর্থনা সংসদের সভাপতি ছিলেন। নবাব ওয়াকার-উল-মূলক, শরীফুদ্দীন(পাটনা), পাতিয়ালার খলিফা মুহম্মদ হোসেন, নওয়াব আলী চৌধুরী, হাসান ইমাম, লক্ষ্ণৌর রাজা নওশাদ আলী খান, খান বাহাদুর সৈয়দ মুহাম্মদ হোসেন, নবাব মুহসিন-উল-মুলক, ডাঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ, কুমিল্লার আলী নওয়াব চৌধুরী, চৌধুরী কেরামত উল্লাহ, মাওলানা শওকত আলী, মৌলবী আওলাদ হাসান, সৈয়দ হোসেন, অমৃতসরের খাজা মুহম্মদ ইউসুফ শাহ খাজা মুহম্মদ আফজাল, শাহাজাদা আফতাব আহম্মদ খান প্রমুখ বিশিষ্ট প্রতিনিধিগন এ অধিবেশনে যোগদান করেন। এদের অনেকে সিমলায় বড়লাটের কাছে প্রেরিত প্রতিনিধি দলে ছিলেন।[২৫]

সরকারী বেসরকারী কয়েকজন ইউরোপীয়ানও শিক্ষা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শরীফুদ্দীন উদ্বোধনী অধিবেশনে ছিলেন। নওয়াব আলী চৌধুরী পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। মাওলানা শিবলী নোমানী ও নবাব মুহসিন-উল-মুলক শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্গভঙ্গের উল্লেখ করে মুহসিন-উল-মূলক নব প্রতিষ্ঠিত প্রদেশের মুসলমানদেরকে নিজেদের উন্নতির জন্য পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে উপদেশ দেন।[২৬] প্রতিনিধিগণ সকলেই বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন। 'দি ইংলিশম্যান' পত্রিকার সংবাদদাতা লিখেছেন যে, "প্রতিনিধিগণ আশা প্রকাশ করেন যে, সরকার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কাছে নতিস্বীকার করে মুসলমানদের বিশ্বাস হারাবে না ও তাঁদেরকে বিপদে ফেলবে না।"[২৭]

৩০শে ডিসেম্বর রবিবার সকালে শাহবাগে শিক্ষা সম্মেলনের শেষ অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ সেখানে এক বিশেষ সভায় মিলিত হবেন। সে অনুযায়ী শাহবাগের

প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। নবাব সলীমুল্লাহর প্রস্তাবক্রমে নবাব ওয়াকার-উল-মূলক এই ঐতিহাসিক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন।[২৮] নবাব সলীমুল্লাহর সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে আলোচনা হয়। সভাপতি উর্দু ভাষায় তাঁর ভাষণ দেন। তিনি সরকারী কর্মচারী ও ছাত্রদেরকে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে নিষেধ করেন এবং এজন্য তাদেরকে সভা থেকে চলে যেতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।[২৯] তিনি সিমলায় মুসলমান প্রতিনিধিদের ঘরোয়া বৈঠকের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, সেখানে তাঁরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন এবং ঢাকায় এ বিষয়ে বিবেচনা করার মত প্রকাশ করেছিলেন। ইতোমধ্যে ঢাকার নবাব বাহাদুর তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পনার খসড়া সকলের নিকট পাঠিয়েছেন। সভাপতি বলেন, "যে বিষয়টি আমরা এতদিন স্থগিত রেখেছি সে সম্পর্কে আমাদের কর্মপন্থা আজ চুড়ান্তভাবে মীমাংসা করতে হবে"।[৩০] তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের রাজভক্তি প্রকাশ করেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি প্রতিবেশী সুলভ মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, প্রতিবেশীদেরকে বিপথে যেতে বাধা দেওয়া মুসলমানদের কর্তব্য। তিনি কংগ্রেসের উত্তেজনামূলক কার্যকলাপের সমালোচনা করেন এবং মুসলমানদেরকে তাঁদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের শালীনতা বজায় রাখতে পরামর্শ দেন। তিনি জানান যে, সিমলায় মুসলিম প্রতিনিধিদেরকে সাক্ষাৎ দানের সময় বড়লাট সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন যে, মুসলমানগণ উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও শিষ্টতার পরিচয় দিয়েছে।[৩১]

এরপর সভাপতি নবাব সলীমুল্লাহকে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার প্রস্তাব পেশ করতে আহবান করেন। নবাব সলীমুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় মুসলামানদের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে আলোচনা করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণের বিষয়ও উল্লেখ করেন।[৩২] তিনি প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা বহু অসুবিধা সত্ত্বেও দেশের দূরবর্তী স্থান হইতে এক মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। এই মুহূর্তে আমাদের

মধ্যে যে অধিকতর রাজনৈতিক তৎপরতার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে আমার বিস্তারিত বর্ণনার আবশ্যক নাই। আমদের দেশ ও সম্প্রদায়ের বিষয়ের সহিত যাহাদের সর্ম্পক আছে তাহারা অবশ্যই অনুভব করিয়াছেন যে, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে নব জীবনের স্পন্দন দেখা দিয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হইতেছে এবং যে মুসলমানদের জীবন স্পন্দন এতদিন রুদ্ধ ছিল তাহাদের মধ্যে এখন জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে।[৩৩] যাহারা আমাদের কার্যকলাপ ভালভাবে লক্ষ্য করে না তাহারা মনে করে যে, আমরা সবেমাত্র রাজনীতেতে নামিয়াছি এবং আমাদের প্রতি যাহাদের শুভেচ্ছা নাই তাহারা মনে করে যে, আমরা যন্ত্রবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নহি এবং আমাদের কার্যকলাপের পিছনে অন্যের হাত রহিয়াছে। কিন্তু যাহারা আমাদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন তাহাদের নিকট আমদের এই প্রচেষ্টা নতুন কিছু বলিয়া মনে হইবে না। মাত্র গতকাল সন্ধ্যায় আমরা শিক্ষা সম্মেলনের বিংশতি অধিবেশন সমাপ্ত করিয়াছি এবং পঁচিশ বছর পূর্বে স্যার সৈয়দ আহমদ খান যে কাজ শুরু করিয়াছিলেন আমাদের বর্তমান কার্যকলাপ তাহারই স্বাভাবিক পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে আমি স্বীকার করি যে, কয়েকটি বাহ্যিক কারণবশত ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন পর্যায়ের রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।"[৩৪]

নবাব সলীমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আন্দোলনের বিষয় উল্লেখ করে বলেন যে, বিলাতের দলীয় সরকার ভারতের প্রকৃত অবস্থা সর্ম্পকে জ্ঞাত নয়, এ কারণে কর্তৃপক্ষ যারা বেশি চিৎকার করতে পারে তাদের কথাই শোনে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করে চলেছে। যদি বিলাতের সরকার ভারতীয় মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা সর্ম্পকে খবর রাখত এবং ভারতের রাজনীতিতে প্রতিপত্তিশালী দেশবাসীগন সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকারের প্রকৃত সুবিচারের পরিচয় দিত তা হলে সম্ভবত দীর্ঘদিন মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিকল্পনার কথা শোনা যেত না এবং মুসলমানরা তাঁদের কার্যকলাপ সম্পূর্নভাবে শিক্ষার উন্নতির প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ রাখতে পারত। মুসলমানরা শান্তশিষ্ট থেকে কিছুই পায়নি। তাঁদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। তাঁদের স্বার্থ রক্ষার জন্য

কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। হিন্দু নেতারা হয়ত অস্বীকার করবেন যে, তাঁরা মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা দেখাননি কিন্তু যারা বাইরে থেকে এ সম্মেলনে যোগ দিতে পূর্ববাংলায় এসেছেন তাঁরা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পেয়েছেন যে, ভারতের অন্তত একটি অঞ্চলে মুসলমানদের অভিযোগের যথার্থ কারণ বিদ্যমান রয়েছে।[৩৫]

নবাব সলীমুল্লাহ বলেন যে, মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অভিনবত্বের কিছু নেই। ১৮৯৩ সালে শ্রদ্ধেয় নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের জন্য এমন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ১৮৮৭ সালে লক্ষ্ণৌতে এক বক্তব্যে স্যার সৈয়দ মুসলমানদের তথাকথিত জাতীয় কংগ্রেসে যোগ না দিতে উপদেশ দিয়েছিলেন।[৩৬] নবাব সলীমুল্লাহ বলেন যে, প্রায় দশ বছর পূর্বে সৈয়দ আহমদ যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন পূর্ববাংলার মুসলমানদের বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে তেমন প্রতিষ্ঠান গঠন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের সম্মুখে চারটি পথ খেলো আছে (১) রাজনীতিতে প্রবেশ না করে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার কাজ সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়া। (২) রাজনীতিতে নেমে হিন্দুদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ করা, (৩) হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেয়া এবং তাদের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা। (৪) মুসলমানদের নিজেদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করা।[৩৭]

মুসলমানরা তৃতীয় পথ অনুসরণ করতে পারে না, কারণ ১৮৮৭ সালের পর তাঁরা কংগ্রেস থেকে সরে গিয়েছে। তাঁরা দ্বিতীয় পথও অনুসরণ করবে না, কারণ মুসলমানদের পরম শত্রুরাও বলতে পারবেনা যে, তাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৮৭ সাল থেকে মুসলমানরা প্রথম পথ অনুসরণ করেছে। তাঁরা রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয়তার পথ অনুসরণ করেছে। কিন্তু এ কারণে তাঁদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। যার ফলে ১৮৯৩ সালে স্যার সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে 'প্রতিরক্ষা সংসদ'

(Defence Association) নামে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। [৩৮] মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এর উদ্দেশ্য ছিল। কারণ শাসকরা তখনও তাঁদের বশ্যতা সম্পর্কে সন্দেহহীন হতে পারেনি। তাঁদের সামরিক বীর্য তখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তখন তাঁদের শিক্ষার উন্নতি অত্যাবশ্যক ছিল, রাজনীতি ক্ষেত্রে অন্যের সমালোচনা করে সময় নষ্ট করার মত অবস্থা তাঁদের ছিল না। [৩৯]

নবাব সলীমুল্লাহ আরো বলেন, এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। অতি সংকটজনক পরিস্থিতিতেও মুসলমানরা রাজভক্তির পরিচয় দিয়েছে। চিত্রল ও সীমান্তের স্বধর্মীয় লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও রক্তক্ষয় করে মুসলমান সিপাহীরা যে রাজভক্তি ও বিশ্বস্থতার পরিচয় দিয়েছে ১৯৯৭ সালে বড়লাট লর্ড এলিগন তার প্রশংসা করেছেন।[৪০] অন্য কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে এমন রাজভক্তির প্রমান দেয়ার সুযোগ হয়নি। মুসলমানরা রাজভক্তির বিশেষ ও অকাট্য প্রমান দিয়েছে। এজন্য তাঁরা সরকারের নিকট বিশেষ সুবিধা দাবি করতে পারে। একসময় মুসলমানদের বিপদজনক বলে মনে করা হত এবং জীবিকার জন্য কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কোন পেশায় তাঁরা ঢুকতে পারত না। এখন শাসকদের কাছে আমাদের মান বেড়েছে, বিলাতে প্রধান রাজনীতিবিদগণ এখন মুসলমানদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজভক্ত পাহারাদার বলে মনে করেন। এখন আর সাম্রাজ্যে বিদ্রোহের আশংকা নেই, সৈন্যদের উপর সীমান্ত পাহারার ভার দিয়ে প্রধান সেনাপতি সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন।[৪১]

নবাব সলীমুল্লাহ মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির উপর জোর দেন। মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য শিক্ষা বিস্তার অত্যাবশ্যক। তিনি মনে করেন যে, নবাব মহসিন-উল-মূলক ও তাঁর সহকর্মী ও আলীগড় কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের প্রচেষ্টায় শিক্ষা বিস্তারের কাজ ভালভাবে চলছে। তিনি আশা করেন যে তাঁর উদ্যমে আলীগড় কলেজের চেয়েও বেশি সৃজনশীল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ভারতে এক অদ্বিতীয় শিক্ষাকেন্দ্রের মর্যাদা অধিকার করবে।[৪২]

২.২ মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও কর্মপন্থা

নবাব সলীমুল্লাহ শিক্ষা সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে প্রস্তাবিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন যে, যুগের পরিবর্তন হচ্ছে, এই যুগধর্মের প্রেরণায় মুসলমানরা এক রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। ১৮৯৩ সাল অপেক্ষা বর্তমানে মুসলমানদের জন্য সক্রিয় প্রচারণা, তাঁদের দাবি দাওয়া ও আশা আকাঙ্খা, অভিব্যক্তি এবং তাঁদের প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি বেশি আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এতে তাঁদের রাজভক্তি হ্রাস পাবে না এবং চিরাচরিত শালীনতাও নষ্ট হবে না।[৪৩] নবাব সলীমুল্লাহ বলেন যে, তিনি যে প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করছেন তার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ এর উদ্দেশ্য হবে। এতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের রাজভক্তি এবং প্রতিবেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের সদ্ভাব ব্যাহত হবে না। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানরা প্রয়োজনমত তাঁদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত সরকারের নিকট উত্থাপন করবে, সরকারের কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে যদি মুসলমানদের মধ্যে কখনও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়, তা দূর করাও এ প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হবে। যে বিষয়ে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের স্বার্থের ঐক্য আছে সে সব বিষয়ে এই প্রতিষ্ঠান সকলের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিবে। মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁদেরকে এককভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অন্য সম্প্রদায়ের ন্যায্য স্বার্থের সাথে মুসলমানদের যাতে সংঘাত না হয় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে। ভারতে বিভিন্ন সম্প্রাদায়ের গৌণ স্বার্থের ব্যাপারে কোন সংঘাতের সম্ভবনা নেই কিন্তু তাদের মূখ্য স্বার্থের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিতে পারে। মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান না থাকলে তাঁদের পক্ষে তাঁদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করা সম্ভবপর হবে না। [৪৪]

নবাব সলীমুল্লাহ বলেন প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সংস্থা ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার মুসলমানদের বিষয়ে এর পরামর্শ গ্রহণ করতে

পারবে, মুসলমানরা এর উপদেশ ও সাহায্য পাবে এবং এর মাধ্যমে সরকারের উদ্দেশ্য জনসাধারনের মধ্যে ভালভাবে প্রচারিত হতে পারবে। বহুদিন থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপকরণ তৈরী হয়ে আছে। এ উপকরণের সাহায্যে এখন সম্মিলিত মুসলমান সম্প্রদায়ের শক্তিশালী ও মহান রাজনৈতিক সৌধের ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছে।[৪৫] এ প্রতিষ্ঠানের শক্তি সম্পর্কে নবাব সলীমুল্লাহ এক মুসলমান কবির কথা উধৃত করে বলেন,

"আযাদ রহু আওর মেরা মাশাক হায় সূলহে কুল
হারগিজ কভি কেসি সে আদাবাদ নাহি মুঝহে"।[৪৬]

এরপর নবাব সলীমুল্লাহ তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। হাকীম আজমল খান, জাফর আলী এবং আরও কয়েকজন প্রতিনিধি প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।[৪৭] তাঁর সংস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সামান্য রদবদল করে অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় এ সভায় 'সর্বভারতীয় মুসলিম সংস্থা' (All India Muslim League) নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য প্রস্তাব করা যাচ্ছে। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধন করা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হবেঃ-

১) ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি রাজভক্তির উদ্রেক করা এবং সরকারের কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের মনে ভুল ধারণা জন্ম হলে তা দূর করা।

২) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা ও উন্নতির ব্যবস্থা করা।

৩) সংস্থার উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলো অব্যাহত রেখে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে যাতে বিদ্বেষভাব সঞ্চার না হয় তার ব্যবস্থা করা। [৪৮]

নবাব ওয়াকার-উল-মূলক ও নবাব মুহসিন-উল-মূলক সর্বভারতীয় মুসলিম সংস্থার (All India Muslim League) যুগ্ম কর্মসচিব নিযুক্ত হন। মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র রচনার

জন্য ৬০জন সদস্য নিয়ে একটি সাময়িক সংসদ (Provisional Committee) গঠিত হয়। এ সংসদকে চার মাস সময় দেয়া হয়। মুসলিম লীগের পরবর্তী অধিবেশনে গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হবে বলে ঠিক করা হয়। ঢাকার এ ঐতিহাসিক অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ সর্মথন করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর নবাব সলীমুল্লাহ অধিবেশন সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সভার কাজ সমাপ্ত হয়।[৪৯]

মুসলিম লীগ গঠনের ও বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক প্রস্তাবের নকল নবাব ওয়াকার-উল-মূলক বড়লাটকে পাঠিয়ে দেন।[৫০] নবাব সলীমুল্লাহর পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সলীমুল্লাহ তার প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছিলেন সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ (All India Muslim Confederacy)। কোন কোন প্রতিনিধি সংঘ শব্দটি পছন্দ করেননি। এজন্য সর্বসম্মতিক্রমে এর নামকরণ হয় 'সর্বভারতীয় মুসলিম সংস্থা' অর্থাৎ 'All India Muslim League'(AIML)। [৫১] সংঘের (Confederacy) পরিবর্তে সংস্থা (League) হলেও প্রতিষ্ঠানের নামের মূল অর্থ একই থাকে। নবাবের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বস্তুত অপরিবর্তিত থাকে এবং তিনি যে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে ইচ্ছা করেছিলেন, তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। [৫২]

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সদরদফতর লক্ষ্ণৌতে স্থাপিত হয়। আগা খান মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি এবং নবাব সলীমুল্লাহ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। আলীগড়ের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আলী নতুন সংগঠনের কর্মসূচী, নিয়মাবলি ও প্রস্তাবমালার খসড়া প্রস্তুত করেন।[৫৩]

১৯০৬ সালের পূর্বে মুসলমানরা দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য স্বারকলিপি, চিঠিপত্র, কখনো কখনো কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী হয়েছে। এর প্রধান কারণ ছিল নিজস্ব দলের অভাব। কিন্তু ১৯০৬ সালে নিজস্ব দল গঠনের পর তাঁরা মুসলিম লীগের মাধ্যমে তাঁদের চাওয়া পাওয়া সরাসরি সরকারের কাছে উপস্থাপিত করে। ফলে সরকার আগের চেয়ে মুসলমানদের

ব্যাপারে কিছুটা হলেও সচেতন হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের চাপের কাছে নতিস্বীকার না করার ব্যাপারে মুসলিম লীগ বারবার সরকারকে সর্তক করে দেয়। যে কারণে স্বদেশী আন্দোলনের[৫৪] তীব্রতার মধ্যেও বঙ্গভঙ্গ রদ করতে ব্রিটিশ সরকার ছয় বছর সময় নেয়।

মুসলমানদের একটি পৃথক দল গঠন হিন্দু নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে পারেননি। হিন্দু সংবাদপত্রগুলো মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার তীব্র সমালোচনা করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় এ দলকে সলীমুল্লাহ লীগ এবং সরকারের ভাতাভোগী ও তাবেদারদের সমিতি বলে বিদ্রূপ কটাক্ষ করা হয়।[৫৫] মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ফলে দেশে শান্তি আসবে কিনা সে বিষয়ে 'লন্ডন টাইমস' পত্রিকা (জানুয়ারী ১৯০৭) সন্দেহ প্রকাশ করে।[৫৬] ভারতের এ্যাংলো ইন্ডিয়ার মুখপত্র 'দি ইংলিশম্যান' মন্তব্য করে যে, মানুষের প্রত্যেক কার্যকলাপের মধ্যেই কিছুটা বিপদের সম্ভাবনা থাকে; মুসলিম লীগ আন্দোলনের মধ্যেও তেমন থাকতে পারে। কিন্তু এরকম লীগ প্রতিষ্ঠা অনিবার্য ছিল, আজ না হলেও আগামীকাল তা প্রতিষ্ঠিত হত। এটা সুখের বিষয় যে, মুসলিম লীগকে যেমন প্রকৃতিতে গঠিত করা হয়েছে তাতে এটি ব্রিটিশ সরকারের গ্রহণযোগ্য হবে এবং তা সাম্রাজ্যের শান্তি বজায় রাখার কাজে সহায়ক হবে।[৫৭] সম্পাদকীয়তে মুসলমান নেতাদের সংকল্প, শালীনতা ও বিজ্ঞতার প্রশংসা করা হয়। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতাগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব ও নিরাপত্তার জন্য পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। রাজভক্তি তাঁদের প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি এবং রাজভক্তি বজায় রেখে নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করা তাদের উদ্দেশ্য। [৫৮]

১৯০৭ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর লীগের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়। বোম্বাইর স্যার আদমজী পীরভাই এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।[৫৯] এ অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব পাশ করা হয়। লীগের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। লীগের সভ্য সংখ্যা ৪০০ নির্দিষ্ট হয়।

৪০ জন সদস্য নিয়ে এর কেন্দ্রীয় কর্মসংসদ গঠনের ব্যবস্থা হয়। ১৯০৭ সালে নবাব মুহসীন-উল-মূলক মৃত্যুবরন করেন এবং নবাব ওয়াকার-উল-মূলক আলীগড় কলেজের কর্মসচিব নির্বাচিত হন। কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করায় ওয়াকার-উল-মূলক মুসলিম লীগের কর্মসচিবের দায়িত্ব বহন করতে অসর্মথ হন।[৬০] এরপর ১৯০৮ সালের ১৮ই মার্চ আলীগড়ে এক বিশেষ সভা আহুত হয় এবং এ সভায় মাননীয় আগা খান লীগের স্থায়ী সভাপতি ও সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী এর কর্মসচিব নির্বাচিত হন। যে সকল নেতা রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার নীতি অনুসরণ করতে মুসলমানদের এতদিন উপদেশ দিয়ে আসছিলেন তাঁরাই মুসলিম লীগে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেন। এর ফলে লীগের পক্ষে রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় হতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল।[৬১]

২.৩ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ (BPML) এর আত্মপ্রকাশ

মুসলিম লীগের কর্মপন্থা নির্ধারণের সুবিধার্থে ১৯০৮ সালে কয়েকটি প্রদেশে মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। জুলাই মাসে নতুন প্রদেশ পূর্ববাংলা ও আসামে মুসলিম লীগের প্রথম প্রাদেশিক শাখা স্থাপনের জন্য একটি 'প্রভিশনাল কমিটি' গঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে নবাব সলীমুল্লাহ মুসা খানকে লিখিত পত্রে উল্লেখ করেন, "The first attempt to establish a branch League for the New Provience of Eastern Bengal and Assam was made in early July 1908 when a provisional committee was formed with Chowdhury Kazimuddin Ahmed Siddiqui as president and Nawab Salimullah as Secretary".[৬২]

সৈয়দ আমীর আলীর উদ্যোগে ১৯০৮ সালের ৬ই মে লন্ডনে মুলিম লীগের শাখা স্থাপিত হয়। আমীর আলীর সভাপতিত্বে লন্ডন লীগ ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে ১৯০৯ সালে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। [৬৩]

মুসলিম লীগের ২য় বার্ষিক অধিবেশন ১৯০৮ সালে ৩০শে ডিসেম্বর অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ আলী ইমাম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর অভিভাষণে লীগের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করেন এবং ভারত সচিব লর্ড মর্লির সংস্কার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন।[৬৪] স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গুলোতে স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকরীতে মুসলমানদের নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা দাবি করে লীগের এ অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে সরকারের নিকট আবেদন করা হয় যাতে বঙ্গভঙ্গ রদ না করা হয়। শাসন সংস্কার পরিকল্পনার ব্যাপারে মুসলমানদের অভিমত সরকারকে জানানোর জন্য একটি প্রতিনিধি দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৬৫]

১৯১০ সালের ২৯ শে জানুয়ারী মুসলিম লীগের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন আর্কটের যুবরাজ স্যার গোলাম মাহমুদ আলী খানের সভাপতিত্বে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় । ১৯০৭ সালে সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী ভারত সচিবের ভারতীয় পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় দিল্লি অধিবেশনে মৌলবী মুহম্মদ আজিজ মীর্যা লীগের কর্মসচিব নির্বাচিত হন।[৬৬] লীগের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন ১৯১০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর নাগপুরে আহুত হয়। সৈয়দ নাজিবুল্লাহ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। লীগের স্থায়ী সভাপতি আগা খানও সভায় যোগ দেন। মুসলিম লীগের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে দিল্লিতে হবার কথা ছিল। কিন্তু একই সময়ে সম্রাটের দিল্লি দরবার অনুষ্ঠিত হওয়ায় লীগের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।[৬৭]

এসময় মুসলিম লীগের বিভিন্ন বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এর শাখা স্থাপন ও কার্যক্রম সম্প্রসারনের ব্যাপারে আলোচনা চলে। অন্যদিকে, বাংলার বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদরা মুসলমানদের সাথে মূলত ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালান।[৬৮] যেহেতু নতুন প্রদেশ পূর্ববাংলা ও আসামের মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণাটি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল যে, ‘Everything to gain and nothing to lose by the (Bengal) partition’.[৬৯] তাই বঙ্গভঙ্গ মুসলমান নেতাদের জন্য তাঁদের

সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রে একটি প্লাটফর্ম তৈরী করেছিল। মূলত, ভারতের মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করাই মুসলিম লীগের মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।[৭০]

১৯০৯ সালের ২১ জানুয়ারী কলকাতায় প্রভাবশালী মুসলিম নেতাদের একটি সাধারণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যার সভাপতিত্ব করেন বিহারের নাসির হোসাইন খান। তাঁর উদ্যোগে এ বৈঠকে মুসলিম লীগের আর একটি প্রাদেশিক শাখা 'পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। এর প্রেসিডেন্ট এবং কর্মসচিব নির্বাচিত হন যথাক্রমে প্রিন্স জেহানদার মীর্যা এবং সৈয়দ শামসুল হুদা। কমপক্ষে একুশ বছর বয়সী যে কোন বাঙ্গালী মুসলিম এ প্রাদেশিক লীগের সদস্য হতে পারবে বলে ঠিক করা হয়।[৭১] সাংগঠনিক বৈঠকে চব্বিশজন সদস্যের মধ্যে এ প্রাদেশিক লীগের কার্যক্রমের দায়িত্ব বণ্টন করা হয় যাদের মধ্যে ছিলেন ছয় জন ভূস্বামী, আটজন ব্যবসায়ী এবং দশজন আইনজীবী।[৭২] পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক লীগের প্রেসিডেন্ট প্রিন্স জেহানদার মীর্যা ছিলেন মুর্শিদাবাদের নিযামত পরিবারের পার্সিয়ান পত্রিকার সম্পাদকের সন্তান। তিনি কেন্দ্রীয় লীগের একজন সাংগঠনিক সদস্যও ছিলেন। পাঁচজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের মধ্যে প্রিন্স গোলাম মাহমুদ, সিরাজুল ইসলাম, সৈয়দ ইউসুফ আলী খান, আহমেদ মুসাজি সালেহজি, খান বাহাদুর ফজলে রাব্বি প্রত্যেকেই অভিজাত পরিবার থেকে এসেছিলেন। তাঁদের অনেকের ভাষা ছিল পার্সিয়ান এবং কথা বলত উর্দু ভাষায়। তাই সাধারণ বাঙালী মুসলমানদের সাথে তাঁদের ধর্ম এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সমন্বয় সম্ভব হয়নি। ফলে কলকাতা শহরের বাইরে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক লীগের তেমন কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় না। ১৯১০ সালে আব্দুর রসুল পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক লীগের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।[৭৩] এসময় পশ্চিমবঙ্গ লীগের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচন ও সংরক্ষিত আসন এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করার দাবি সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তবে পূর্ববাংলার মুসলমানদের অন্যতম বিষয় বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ লীগের ভূমিকা অনুপস্থিত ছিল।[৭৪]

২.৪ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রম

১৯০৬ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত সময়কে বাংলা তথা ভারতে মুসলিম লীগের গঠনতান্ত্রিক উন্নতির স্তর হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে এসময় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' এর পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই ১৯০৯ সালের অক্টোবরে ঢাকায় নবাব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' গঠিত হয়।[৭৫] ইতোমধ্যে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য ভারত সচিব লর্ড মর্লি ও ভাইসরয় লর্ড মিন্টো যে প্রস্তাব পেশ করেন তা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়ে ১৯০৯ সালের 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট'-এর অঙ্গীভূত হয়। 'মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন' নামে পরিচিত এ নতুন আইনে মুসলমানদের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিষদে ছয়টি সংরক্ষিত আসন এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।[৭৬] এ ঘোষণায় বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন।[৭৭]

এরপর ১৯১১ সালের ১৭ মার্চ সলীমুল্লাহর বাস ভবন আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত সভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আলোচনা হয়। এ সভায় নবাব সলীমুল্লাহ প্রেসিডেন্ট এবং ধনবাড়ির খান বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী লীগের কর্মসচিব নির্বাচিত হন। এছাড়া আরো ১১ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন যাদের মধ্যে ছিলেন: চৌধুরী কাজিমুদ্দীন আহমদ সিদ্দীক, চৌধুরী মুহাম্মদ ইরশাদ আলী খান, খান বাহাদুর সৈয়দ হুসাম হায়দার চৌধুরী, মুহাম্মদ ইসমাইল খান চৌধুরী, খাজা আতিকুল্লাহ (নবাব সলীমুল্লাহর ভাই), খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ, ওয়াজেদ আলী খান পন্নি, নবাব আব্দুস সবহান চৌধরী, নবাব খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ, মৌলবী শামস-উল-হুদা এবং নবাবজাদা সৈয়দ মুহাম্মদ হুসাইন। এছাড়া ঢাকার মিউনিসিপল কমিশনার মৌলবী আমীরুদ্দীন আহমেদ ও খলিলুর রহমান যুগ্মসচিব নিযুক্ত হন।[৭৮]

ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের পাশাপাশি এ সময় ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের কারণে সৃষ্ট বাংলার অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিরসন করে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলা প্রদেশকে পুনরায় একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আসেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। এরপর ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লি দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জের বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষনার মাধ্যমে ১৯০৫ সালে সৃষ্ট পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বিলুপ্তি ঘটে এবং বাংলা ভাষাভাষী বিভক্ত অঞ্চল সমূহ পুনরায় একত্রিত হয়। ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল বঙ্গভঙ্গ রদ কার্যকর করা হয়।[৭৯] বঙ্গভঙ্গ রদের এ সরকারী সিদ্ধান্তে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তাদের মাঝে হতাশা নেমে আসে। তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, বঙ্গভঙ্গ যুগে মুসলমানরা শিক্ষা ও চাকুরীলাভ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি অর্জন করেছিল বাংলা পুনরায় একত্রিত হওয়ার ফলে তার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে।

বঙ্গভঙ্গ রদের অব্যবহিত পরেই ১৯১১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর নবাব সলীমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গ রদ উদ্ভুত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য ঢাকায় প্রাদেশিক লীগের উভয় বাংলার মুসলমান নেতাদের এক যৌথ সভার আয়োজন করেন। ঐ সভায় বাংলার অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে খাজা আতিকুল্লাহ, আব্দুর রসুল, মৌলভী মুজিবর রহমান প্রমুখ বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণও অংশগ্রহণ করেন।[৮০] সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর কয়েকটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এগুলোর মধ্যে আব্দুর রসুল কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ছিল উল্লেখযোগ্য। আব্দুর রসুল তাঁর ঐ প্রস্তাবে বঙ্গভঙ্গ রদের পটভূমিতে সমগ্র বাংলার মুসলমানদের জন্য একটি শক্তিশালী ও প্রতিনিধিত্বশীল স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, “That in view of the the recent administrative changes, it is desirable that a strong representative association for the whole of Bengal be established, with headquarters at calcutta and branches in all the districts and sub districts to promote the

advancemnt and welfare of the Mohomedans of Bengal."[৮১] মৌলভী মুজিবর রহমান আব্দুর রসুলের ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন।[৮২]

নবগঠিত বাংলায় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলার মুসলিম রাজনীতিকদের আগ্রহ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সম্পাদক আজিজ মীর্জা[৮৩] বাংলার নেতৃস্থানীয় নেতা আব্দুর রসুলের কাছে লিখিত এক পত্রে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের বিকল্প স্বতন্ত্র প্রাদেশিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা না করার আহবান জানান। তিনি তাঁর পত্রে উল্লেখ করেন যে, ".....The All India Muslim League to represent the whole Muslim population and the important Presidency of Bengal does not accommodate it, its (AIML'S) position will certainly be undermined and it will never be able to speak on behalf of the Muslims of India."[৮৪]

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষাপটে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মনে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় তার তীব্রতা প্রশমনের জন্য ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা সফরে আসেন। এ সময় নবাব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে সাক্ষাত করেন। ভাইসরয় প্রতিনিধিবৃন্দকে নবগঠিত প্রদেশে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বঙ্গভঙ্গকালীন সময় শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ববাংলার মুসলমানদের যে অগ্রগতি সাধিত হয় তার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে মুসলমানরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হন তার প্রতিবিধানের জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং পূর্ববাংলার মুসলমানদের জন্য একজন বিশেষ শিক্ষা অফিসার নিয়োগের বিষয়েও প্রতিনিধিবৃন্দকে আশ্বাস প্রদান করেন। ১৯১২ সালের

২রা ফেব্রুয়ারী ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারী সিদ্ধান্তের কথা জনগণের নিকট প্রচার করা হয়।[৮৫]

নবাব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে রাজানুগত মুসলমান নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ রদের সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালেও বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণাকে তাঁরা রাজ আজ্ঞা হিসেবেই মেনে নেন।[৮৬] কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজের তরুণ ও শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ এ ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেন। ১৯১২ সালের ১৩ এপ্রিল ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের (BPML) প্রথম অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্তের প্রতি তীব্র নিন্দা করা হয়। এ অধিবেশনে বাংলার মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের ভাবধারা ও আশা আকাঙ্খার প্রতীক এ.কে. ফজলুল হক[৮৭] প্রাদেশিক লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময় থেকে মুসলিম লীগে বাংলার শিক্ষিত মুসলমান যুবক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি পেশার নেতৃত্ব পরিলক্ষিত হয়।[৮৮]

এসময় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের কর্মপন্থার সাথে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সমন্বয় সাধন করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা কেন্দ্রীয় লীগের বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন বাংলার বাইরে থেকে আগত। ১৯০৬ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে মুসলিম লীগের বিভিন্ন অধিবেশনে মোট ছিচল্লিশটি আইন পাশ হয়।[৮৯] যার মধ্যে মাত্র দুইটি ছিল বঙ্গভঙ্গের পক্ষে। কেন্দ্রীয় লীগের সদস্যরা বাংলা প্রদেশের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এমনকি ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের গঠনের সময় এর দাপ্তরিক ভাষা নিয়েও লীগের সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রতিনিধি হিসেবে মৌলবী আব্দুল করিম তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, “..... The Muslims of Eastern Bengal cannot do without Bengali, the vernacular of the province. They could do without the other two languages (Urdu and Parsian)..... This I think from being a ‘Suicidal policy’ is rather a policy of self preservation.”[৯০]

এসময় প্রাদেশিক লীগের নেতাদের প্রধান উদ্বেগের বিষয় ছিল নতুন প্রদেশের স্বতন্ত্র, সংরক্ষিত আসন ও স্বতন্ত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা উপস্থাপন এবং মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি। যদিও এ বিষয়গুলো দরিদ্র বাঙ্গালী মুসলমানদের জীবনে তাৎক্ষনিক কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।[৯১] তবে লীগের নেতারা ব্রিটিশ সরকারে নিয়ম কানুনের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করে তাঁদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বেশিরভাগ নেতাই অভিজাত পরিবারের অবাঙ্গালী ছিলেন। তাঁদের অনেকেই বাংলায় বসবাস করলেও তাঁদের ভাষা ছিল উর্দু, পার্সি অথবা হিন্দি। অনেক সদস্যদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা তাঁদের উঁচু স্থানের মর্যাদা দিয়েছিল। তাই সাধারণ মুসলিম সমাজকে সমবেত করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। যদিও নবাব সলীমুল্লাহ এবং নবাব আলী চৌধুরী বিভিন্ন জেলা এবং বিভাগীয় শহর পরিদর্শন করে লীগের স্থানীয় শাখা স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি এবং প্রাদেশিক লীগের সদর দপ্তর আহসান মঞ্জিলেই এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।[৯২]

এতদসত্ত্বেও, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানরা সর্বভারতীয় পর্যায়ে একত্রিত হয়। রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁদের এতদিনের অনীহার বদলে গভীর আগ্রহের জন্ম হয়। ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানরা একটি সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৯৩] কংগ্রেস যেমন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল ঠিক তেমনি বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম লীগ মুসলমানদের সমবেত করে। মুসলমানদের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তাঁদের অংশগ্রহণ বহুগুনে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানদের রাজভক্তির চরম পরীক্ষা হয়। রাজভক্ত থেকেও তাঁরা সরকারের কাছে থেকে আঘাত পান। একারণে যুবক ও শিক্ষিত মুসলমানরা তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের রাজভক্তির নীতির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[৯৪] পরবর্তী

অধ্যায়ে মুসলিম লীগের পরিবর্তিত কর্মপন্থা এবং কেন্দ্রীয় লীগ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের কর্মপন্থার সমন্বয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১। Harun-or-Rashid. The Foreshadowing of Bangladesh, Bangal Muslim League and Muslim Politics (1906-1947), Asiatic Society of Bangladesh, The University Press Limited, Dhaka, 1987, P: 2.

২। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' একটি মহাচুক্তি। ভূমি নিয়ন্ত্রণে ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কার কোন স্থান ও ভূমিকা তা নির্ধারণের জন্য ১৭৯৩ সালের ২২শে মার্চ লর্ড কর্নওয়ালিশের সময় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে একটি আইন পাশ হয়েছিল। এ আইনে সরকার জমিদারকে জমির একমাত্র মালিক বলে স্বীকার করে নেয় এবং অঙ্গিকার করে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে গ্রহণকারী জমিদার ও তালুকদারদের উপর ধার্যকৃত সরকারী জমা চিরকালের জন্য অপরিবর্তনীয় থাকবে। সুত্রঃ সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাসঃ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃঃ ১০৩।

৩। ডঃ আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১), বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃঃ ৪০-৪১।

৪। Dr. A. R. Mallik, The Muslims and the Partition of Bengal, Pakistan History Assciation, Karachi, 1905, P: 21.

৫। ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (১৭৫৭-১৯৪৭), চতুর্থ প্রকাশ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৫১।

৬। শেখর বন্দোপাধ্যায়, পলাশি থেকে পার্টিশন, আধুনিক ভারতের ইতিহাস, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৬, পৃঃ ১২৯।

৭। A.R. Mallik, op. cit., P: 16-17.

৮। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫২।

৯। Sharifuddin Pirzada, Foundation of Pakistan: All India Muslim League Documents (1906-1947), Vol-1, Karachi, 1969, P: 43।

১০। Memories of Ameer Ali, Islamic Culture, Vol-5, Dhaka, 1935, P: 208.

১১। K.K. Aziz, Britain And Muslim India, London, P: 82.

১২। সিমলা ডেপুটেশনের স্বারকলিপি প্রণয়নে এবং প্রতিনিধি দলের সদস্য নির্বাচনে নবাব মহসিন-উল-মূলক অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৬ সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌতে স্যার আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে স্মারকলিপিটি অনুমোদিত হয়। অনেক বাছাইয়ের পর পঁয়ত্রিশ জনকে প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সিমলা সাক্ষাৎকারের পর মুসলিম নেতাদের মনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। সূত্র: S.M. Ikram. Modern Muslim India, 2nd Edition, Calcutta, 1965, P: 92.

১৩। Ibid., P: 148.

১৪। আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৪-৪৫।

১৫। S. Pirzada, op. cit., P: 229.

১৬। Muhammad Ali, Meeting at Dhaka, 30 December 1906, P: 5.

১৭। এম. এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৩।

১৮। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানরা যখন ব্রিটিশ শাসনের রোষাণলে পড়ে চরম দুরাবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন এবং রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে পদে পদে বিপদের সম্মুখীন ঠিক সে সময়ে মুসলিম সমাজকে পুনর্গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়

নিয়ে এগিয়ে আসেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। তিনি ভারতে মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার এবং তাদের সার্বিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৮৭৫ সালে আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ কলেজকে কেন্দ্র করেই এক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল যা ইতিহাসে 'আলীগড় আন্দোলন' নামে পরিচিত। সূত্র: মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৭০৭-১৯৪৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ: ৬৮।

১৯। S.Pirzada, op. cit., P: 45, The Bengali, 24 December, 1906.

২০। Ram Gopal, Indian Muslims: A Political History (1858-1947), First Published: Bombay, 1959, P: 151.

২১। The Englishman, 20 December, 1906.

২২। M. A. Rahim, The Muslim Society and Politics in Bengal (1757-1947), Dhaka, The University of Dhaka, 1978, P: 223.

২৩। M. S. Khan, Birth of Muslim League, Pakistan Observer, 23 March, 1968, P: 9.

২৪। ঢাকা প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯০৭।

২৫। Muhammad Ali, op. cit., P: 5.

২৬। Journal Muslim, January 1907.

২৭। M. S. Khan, op. cit., P: 10.

২৮। ২৯ শে ডিসেম্বর রাতে প্রধান অথিতিরা ঘরোয়াভাবে পরিকল্পনা আলোচনা করেন। কেউ কেউ confederacy শব্দের আপত্তি করেন। সূত্রঃ এম, এ, রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৪।

২৯। J. H. Broomfield, Elite conflict in a plural society: Twenteeth-Century Bengal, USA, University of California Press, 1968, P: 48.

৩০। Muhammad Ali, op. cit., P: 6.

৩১। M. S. Khan, op. cit., P: 13।

৩২। এম. এ. রহিম , পূর্বোক্ত পৃঃ ১৬০।

৩৩। The Bengali, 1 January 1907.

৩৪। ঢাকা প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯০৭।

৩৫। এম. এ. রহিম পূর্বোক্ত পৃঃ ১৬১।

৩৬। K.K. Aziz, op. cit., P: 26.

৩৭। Ikram, op. cit., P: 122.

৩৮। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১।

৩৯। M. S. Khan, op. cit., P: 13.

৪০। A. R. Mallik, op. cit., P: 14.

৪১। এম. এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬২।

৪২। Muhammad Ali, op. cit., P: 16.

৪৩। I. H. Qurashi, Struggle for Pakistan; History of the Freedom Movement, 3rd part, Karachi, 1962, P: 28.

৪৪। এম. এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৩।

৪৫। Pakistan Observer, March, 1968.

৪৬। মুহাম্মদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯।

৪৭। Abdul Hamid, Muslim Separatism in India, A Brief Survey, 1858, 1947, Oxford University Press, 1967, P: 62.

৪৮। এম. এ. রহিম, পূর্বোক্ত পৃ: ১৬৩।

৪৯। M. S. Khan, op. cit., P: 13.

৫০। Muhammad Ali, op. cit., P: 19.

৫১। S. Prizada, op. cit., P: 213.

৫২। The Englishman, 4 January 1907.

৫৩। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৩।

৫৪। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার আগেই কংগ্রেসের নেতৃত্বে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেয়। বিলেতি পণ্য বয়কটের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি ছিল বয়কট কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। এর ফলে বিলেতি কারখানা ও মিল ফ্যাক্টরিগুলোতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে ভাবতে থাকে। এমন কি বৃটিশ বণিকগণ সরকারের উপর বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। তবে

স্বদেশী আন্দোলনের এক পর্যায়ে গঠিত গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠনের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা, বিচারক, ইংরেজ শাসকদের হত্যার কর্মসূচী ব্রিটিশ সরকারকে ভীষণ ভাবে চিন্তিত করে। বিপ্লবীরা বাংলার গভর্নর ফ্রেজার, বড়লাট মিন্টো, পূর্ববাংলা ও আসামের গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা চালায়। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। হত্যার দায়ে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীসহ অনেকের ফাঁসি হলেও এ কর্মকান্ড অব্যাহত থাকে যা ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদ নিয়ে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। সূত্র: সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বঙ্গভঙ্গ রদের প্রক্রিয়া: শাসনতান্ত্রিক বিশ্লেষণ, ইতিহাস, ১৩ বর্ষ, ১ম -৩য় সংখ্যা, ১৩৮৬, পৃ: ৩।

৫৫। The Bengali, 18 January 1907.

৫৬। London Times, 20 January 1907.

৫৭। The Englishman, 22 January 1907.

৫৮। M.S. Khan, op. cit., P: 14.

৫৯। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৪।

৬০। Mohammad Noman, Muslim India, Allahbad Law Journal Press, Allahbad, 1942. P: 75.

৬১। Abdul Hamid, op. cit., P: 79.

৬২। Nawab Salimullah to Musa Khan, Secretary (AIML), 11 July 1908, File BPML, Vol-34, P: 7-8, in Archives of Freedom Movement (AFM), Karachi, 1908.

৬৩। M. S. Khan, op. cit., P: 25.

৬৪। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৩।

৬৫। Mohammad Noman, op. cit., P: 78.

৬৬। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৫।

৬৭। Leonard A. Gordon, Bengal: The Nationalist Movement 1876-1940, New York, Colombia University Press, 1947, P: 28.

৬৮। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 2.

৬৯। Mohammed Noman, Muslim India, Allahabad: Allahabad Law Journal Press, 1942, P: 88.

৭০। The Bengalee, 10 January 1907, P: 8.

৭১। Rules and Regulations of the West Bengal Provincial Muslim League (1909), BPML, P: 91.

৭২। The Bengalee, 23 January 1909.

৭৩। Matiur Rahman, From Consultation to Confrontation: A Study of the Muslim League in British Indian Politics (1906-1912), London, 1970, P: 78.

৭৪। Half–yearly Report of the West Bengal Muslim League for 1910, BPML, Vol: 38, P: 82.

৭৫। Matiur Rahman, op. cit., P: 67.

৭৬। উল্লেখ্য যে, ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগাখানের নেতৃত্বে একটি মুসলমান প্রতিনিধিদল ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাত করে যে সকল দাবি দাওয়া উত্থাপন করেন তার মধ্যে

রাজনৈতিক গুরুত্বের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক কাউন্সিলে মুসলমানদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখার কথাও বলা হয়। সৈয়দ আমীর আলীও লন্ডনে স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষে সরকারী মহলে ব্যাপক প্রচারণা চালান। ফলে সরকারও মুসলমানদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে এ ব্যবস্থাকে ভারত শাসন আইনের অন্তর্ভুক্ত করে। সূত্রঃ বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ২৯।

৭৭। সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙ্গালীর রাষ্ট্র চিন্তা (প্রথম খন্ড), কলকাতা, ১৯৯১, পৃঃ ২৯২।

৭৮। Gautam Chattopadhyay, Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle (1862-1947), New Delhi, 1984, P: 47.

৭৯। List of Office-bearers in Syed Nawab Ali Chowdhury to Secretary, AIML, 25 July 1911, BPML, Vol: 35, 1910-11, P: 72-73.

৮০। Sufia Ahmed, Muslim Community in Bengal (1884-1912), Dhaka, 1974, P: 300.

৮১। আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর বরিশালের চাখার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার রাজনীতিতে তাঁর আর্বিভাব বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা করেছিল। সূত্রঃ M. A. Rahim, op. cit., P: 223.

৮২। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮।

৮৩। আজিজ মীর্জা (১৮৬৫-১৯১২) ১৯৮৭ সালে আলীগড়ে অবস্থিত 'মহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' থেকে বি.এ. পাশ করেন। তিনি হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতিরূপেও দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯০৯ সালে এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে তিনি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অনারেরী সেক্রেটারী

নির্বাচিত হন। সূত্রঃ Naresh Kumar Jain, Muslims in India, Vol:1, New Delhi , 1976, P: 111.

৮৪। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 121.

৮৫। Sufia Ahmed, op. cit., P: 300.

৮৬। Ibid., P:299, ঐ সভায় উপস্থিত বাংলার অন্যান্য মুসলমান নেতারা হলেন নবাব স্যার সলীমুল্লাহ, নবাব খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর, সৈয়দ হোসাইন হায়দার চৌধুরী খান বাহাদুর, মৌলভী সৈয়দ আব্দুল জব্বার, ডঃ এ.এ. সোহরাওয়ার্দী, এ. আজিজ, মৌলভী হেমায়েত উদ্দীন আহম্মদ, মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাইল, মৌলভী আমীন উদ্দীন, মীর্যা ফকির মুহাম্মদ, হাকিম হাবিবুর রহমান, গোলাম মহিউদ্দীন, মৌলভী আব্দুল হক, মুন্সী আব্দুল গফুর, দিউয়ান কামদাদ খান, মৌলভী আব্দুল মালিক, মুন্সী আসগর হোসাইন খান, মৌলভী আব্দুস সামাদ এবং মুন্সী আহমেদ হোসাইন খান। সূত্রঃ Sufia Ahmed, op. cit. P: 300.

৮৭। Abdul Hayat, Mussalmans of Bengal, Calcutta, 1966, P: 21-22.

৮৮। Ibid.

৮৯। Chandiprasad Sarkar, The Bangali Muslims: A Study in their Politicization (1912-1929), Calcutta, 1991, P: 24.

৯০। Abdul Karim’s letter in The Bengalee, 11 January 1907, P: 3.

৯১। “Polities in Rural Bengal 1907”, The Bengalee, 24 January 1907, P: 9.

৯২। The Eastern Bengal and Asam Era, 23 June 1970, P: 4.

৯৩। S. M. Ikram, op. cit., P: 67.

৯৪। J. H. Broomfield, op. cit., P: 51.

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম (১৯১২-১৯৩৫)

বাংলার রাজনীতিতে ১৯১২-১৯৩৫ সালের ঘটনাবলী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা বিংশ শতাব্দীর এ পর্যায়ে ভারতের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সংঘটিত কিছু ঘটনা বাংলা তথা ভারতের মুসলমানদের চেতনাকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে। বঙ্গভঙ্গ রদের সরকারী ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমানদের অনুভূতিতে প্রথম আঘাত লাগে এবং এসময় থেকে বাংলার রাজনীতি ও মুসলিম লীগ ব্যাপকভাবে কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। যদিও ১৯৩৫ সালের দিকে বাংলার মুসলিম লীগের কর্মকান্ড কিছুটা নির্জীব হয়ে পড়েছিল তবে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে দলটির পুনর্জাগরণ ঘটে।

৩.১ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মপন্থায় সমন্বয় সাধনের চেষ্টা

বঙ্গভঙ্গ রদজনিত কারণে বাংলার মুসলমানদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারনের জন্য ১৯১২ সালের ২রা মার্চ কলকাতার ডালহৌসী ইনষ্টিটিউটে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলিম কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়।[১] নবাব সলীমুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় বাংলার ২৫টি জেলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে আব্দুর রসুল, মৌলভী আবুল কাশেম, মাওলানা আকরাম খান প্রমুখ মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। আবুল কাসেম ঐ কনফারেন্সের অভ্যর্থনা কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।[২] বাংলার মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক সংঘ গঠন করাই ঐ কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য ছিল। নবাব সলীমুল্লাহ বাংলার মুসলমানদের জন্য একটি প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও তিনি মুসলিম লীগ এর সাথে সংযোগ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এ

জন্য তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে বঙ্গভঙ্গকালীন সময়ে গঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' ও 'পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' কে যুক্ত করে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ' গঠন করার পক্ষে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন।

এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার অধিকাংশ মুসলিম রাজনীতিক নবাব সলীমুল্লাহর মতকে সমর্থন করাই সমীচীন মনে করেন। কারণ বাংলার মুসলমানদের উপর তখনও নবাব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বাধীন সরকার সমর্থক ও রক্ষণশীল মুসলমানদের প্রভাব বজায় ছিল। তাই নবাব সলীমুল্লাহর অভিপ্রেত বিষয়টি যখন প্রস্তাবাকারে উত্থাপন করা হয় তখন আব্দুর রসুল উক্ত প্রস্তাবের প্রতি তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।[২৩]

নবগঠিত 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ'- এর সভাপতি নবাব সলীমুল্লাহ এবং বাংলার মুসলিম রাজনীতিকদের মধ্য থেকে মৌলভী আবুল কাসেম যুগ্ম সম্পাদক এবং আব্দুর রসুল কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।[৪] বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ এর সদর দফতর কলকাতায় স্থাপিত হয়। এটি গঠনের পর থেকে বাংলার মুসলিম রাজনীতিকগণ মুসলিম লীগের কর্মকান্ডে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন।[৫]

এসময় বঙ্গভঙ্গ রদের পটভূমিতে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগ সদস্যদের মনোভাবের পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তাঁরা দলের রাজনৈতিক কর্মসূচী পুনর্বিবেচনা ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলে মনে করেন। মুসলিম লীগের তরুণ সদস্যরাই মূলত এ দাবির প্রতি সোচ্চার হন।[৬] এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার মুসলিম রাজনীতিকগণও সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সদস্যদের এ দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ১৯১২ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের প্রাক্কালে মৌলভী মুজিবর রহমান বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানদের পরিবর্তিত মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মুসলিম লীগের সদস্যপদ বৃদ্ধি ও এর কর্মসূচী বিস্তারের জন্য এবং এর সংবিধান সংক্রান্ত সকল অঙ্গসংগঠন সমূহের সমস্যার নিরসন কল্পে একটি কমিটি গঠন করার জন্য

এক প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করেন।[৭] মুসলিম লীগকে একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে মুজিবর রহমানের এ প্রস্তাব ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এর পরিপ্রেক্ষিতেই কলকাতা অধিবেশনে মুসলিম লীগের নীতি ও সংবিধান পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য এর সাধারণ সম্পাদক ওয়াজির হাসানকে[৮] নির্দেশ দেয়া হয়।[৯]

এরপর ১৯১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর বাঁকীপুরে আগা খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশনে এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর আমূল পরিবর্তন সাধন করে একটি নতুন সাংবিধানিক খসড়া প্রণয়ন করা হয়[১০] যা ১৯১৩ সালের ২২ ও ২৩ শে মার্চ লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।[১১] ঐ অধিবেশনে নতুন সংবিধানে ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসনকে মুসলিম লীগ সংগঠনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়। এতে যৌথ কার্যপ্রণালী নির্ধারণের জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের পর্যায়ক্রমিক বৈঠকের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়।[১২] ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌতে হিন্দু মুসলমান সমঝোতা চুক্তি তথা 'লক্ষ্মৌ প্যাক্টের' প্রেক্ষাপট রচনায় মুসলিম লীগের এ কাঠামোগত পরিবর্তন ছিল নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

এসময় বঙ্গভঙ্গ ছাড়াও ভারতের বাইরে সংঘটিত আরও কতিপয় ঘটনা বাংলার মুসলমানদের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ও আলোড়িত করে। ১৯১১ সালে ইটালী কর্তৃক তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত ত্রিপলী আক্রমন এবং ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে বলকান রাষ্ট্র সমূহ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতের মুসলমানরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কারণ তুরস্কের খলিফা ছিলেন ইসলামের পবিত্র স্থান সমূহের (মক্কা, মদীনা, জেরুজালেম) তত্ত্বাবধায়ক এবং সমগ্র বিশ্বের সুন্নী মুসলমানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা। তাই বলকান যুদ্ধ ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। এরূপ পরিস্থিতিতে বৃটেন তুরস্কের শত্রু গোষ্ঠীদের পক্ষাবলম্বন করলে বলকান যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।[১৩] বাংলার মুসলমানদের মুখপত্র 'দি মুসলমান' পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম রাজনীতিকরা বলকান যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ তুর্কীদের সাহায্যের জন্য

ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালান। ফলে 'দি মুসলমান' পত্রিকাটি ব্রিটিশ সরকারের রোষাণলে পড়ে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারী মি.জি. কামিং এক পত্রে 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী মুজিবর রহমানকে সতর্ক করে দেন।[১৪]

এরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলার মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা নবাব সলীমুল্লাহ ১৯১২ সালের পর প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এসময় বাংলার রাজনীতিতে আবুল কাশেম ফজলুল হকের আবির্ভাব বাংলার মুসলিম রাজনীতিকদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে। ফজলুল হক নবাব সলীমুল্লাহর আশীর্বাদে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করলেও অচিরেই তিনি নবাবের রাজনৈতিক আদর্শকে পরিত্যাগ করে সরকারের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন।[১৫] শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে এ.কে. ফজলুল হক মুসলমানদের প্রধান নেতার আসন দখল করেন। ফজলুল হক ও তাঁর রাজনৈতিক সহচরেরা মুসলিম রাজনীতিতে নতুন কর্মপন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ রাজভক্তি নীতি পরিহার করেন। দেশের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রামে তাঁরা হিন্দুদের সাথে সহযোগীতা করার পক্ষপাতি ছিলেন আবার মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন। ফজলুল হক তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই বাংলার জনপ্রিয় নেতা হয়ে ওঠেন। কৃষকদের জন্য তাঁর অকৃত্রিম দরদ, মুসলমানদের জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর দুর্দম সাহসের জন্য তাঁর নাম বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১২ সালে তিনি বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মসচিব নির্বাচিত হন। ১৯১৩ সালে ফজলুল হক ঢাকা বিভাগ থেকে বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।[১৬]

১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে ফজলুল হক বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য হিসেবে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন। এ বক্তৃতায় তিনি যেমন সাহসের সাথে সরকারের নীতি ও কাজের তীব্র সমালোচনা করেন তাতে তাঁর তেজস্বিতা ও স্বাধীনতার স্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বক্তৃতায় মুসলিম রাজনীতিতে এক নতুন সুর ধ্বনিত হয়, বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের রাজভক্তির সুরের সাথে এ সুরের সঙ্গতি ছিল না। শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় ফজলুল হককে তাঁর জোরদার

বক্তৃতার জন্য এমনভাবে অভিনন্দিত করে যাতে মনে হয় যে, বাংলার রাজনীতিতে তখন একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল।[১৭] বঙ্গভঙ্গ রদ করায় ফজলুল হক সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এ গুরুতর অন্যায়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিনি মুসলমানদের শিক্ষার জন্য অবিলম্বে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা দাবি করেন। ১৯১৩ সালের ১৩ই এপ্রিল ঢাকায় বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণেও ফজলুল হক তাঁর স্বাধীন চেতনা সংগ্রামী মনের প্রমাণ দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী হবে এবং ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে। তখন চুক্তি অনুযায়ী উভয় সম্প্রদায় ক্ষমতার অংশীদার হবে। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ফজলুল হক মুসলিম লীগের সভ্য হয়েও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।[১৮]

স্বায়ত্তশাসন মুসলিম লীগের লক্ষ্য ছিল। ইতোমধ্যে কংগ্রেসও স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এর ফলে এ পর্যায়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে লক্ষ্মৌতে মুসলিম লীগের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু এই দুই জন বিশিষ্ট কংগ্রেস সভ্য যোগদান করেন এবং সরোজিনী নাইডু লীগের সভায় বক্তৃতাও করেন। এ দুই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সমঝোতার জন্য কংগ্রেস ও লীগের নেতাগণ যুক্ত বৈঠকের ব্যবস্থা করেন।[১৯]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯১২ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠাকালের পর থেকে ১৯১৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত এর কোন বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি। ঐ বছরই ১৩ই এপ্রিল ঢাকায় 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগে'র প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[২০] বাংলার জনপ্রিয় নেতা এ.কে. ফজলুল হক ঐ অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগে' এ সময় রক্ষণশীল মুসলমানদের প্রভাব বজায় থাকা সত্ত্বেও ঐ অধিবেশনে বাংলার মুসলিম রাজনীতিকদের চাপে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার পার্থক্য নিরসনে কলকাতায় উভয়

সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের ব্যতিক্রমধর্মী প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২১] ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে নবাব সলীমুল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগে' রাজানুগত ও রক্ষণশীল মুসলমানদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এ.কে. ফজলুল হক বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক নিযুক্ত হন।[২২]

১৯১৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন বোম্বাই শহরে মাঝহারুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় নবাব সলীমুল্লাহ, আলতাফ হোসেন হালী ও খাজা গোলাম-উস-সাকলাইনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস অধিবেশনও এ সময় বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সভাপতি এস.পি. সিংহ ও লীগের সভাপতি মাঝহারুল হক তাঁদের অভিভাষণে হিন্দু মুসলিম ঐক্য ও সহযোগীতার উপর জোর দেন। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, আব্দুর রসুল, ফজলুল হক ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ হিন্দু মুসলিম মৈত্রীর জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে স্থির হয় যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে এ দুই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ সরকারের কাছে যুক্ত পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। পূর্ববাংলার পক্ষ থেকে এ কমিটিতে ১১ জন সভ্য ছিলেন। নওয়াব আলী চৌধুরী, আব্দুর রসুল, এ.কে. ফজলুল হক, মুহাম্মদ ইসমাইল খান, মুজিবর রহমান, মাওলানা আকরাম খান ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।[২৩] কংগ্রেসও শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি সংস্কার কমিটি গঠন করে। মূলত ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল বলে ব্রিটিশ সরকার ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের পরিকল্পনা করে। এর ফলে ভারতের রাজনীতিবিদদের মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এ সময় ভারতের জন্য প্রবর্তিত সংস্কার পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে একটি সমঝোতা স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এদিকে ১৯১৬ সালের ২৪ শে এপ্রিল বর্ধমানে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগে'র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[২৪] আব্দুর রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ অধিবেশনে বাংলার মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দরাই একচেটিয়া ভাবে কৃর্তত্ব করেন। সভাপতি হিসেবে আব্দুর রসুল ঐ অধিবেশনে জ্ঞানগর্ভ ও পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। সভাপতির ভাষণে তিনি মাতৃভূমির কল্যাণ সাধনের জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার উপর গুরুত্বারোপ করেন। কারণ তাঁর মতে উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যেই মাতৃভূমির কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। মুসলমানরা পুরানো ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে রাজনীতি চর্চায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায় তিনি তাদের সাধুবাদ জানান। রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আব্দুর রসুল মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনার জন্য আহবান জানান। তিনি বলেন যে, "There is a Bengali proverb 'It is only the crying child that gets the milk.' In the history of the world has anybody politic ever got any right or concessron without ever asking for it? No. Before you ask for any such right or consession with any hope or prospect of suceess, you must organise yourselves and agitate for it."[২৫]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের অভ্যন্তরে নিজেদের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করার পর বাংলার মুসলিম রাজনীতিকবৃন্দ গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য হিন্দুদের সাথে সমঝোতা স্থাপনে সর্বভারতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের উদ্যোগেও অংশগ্রহণ করেন। ফলে অল্প সময়ের জন্য হলেও কেন্দ্রীয় লীগের সাথে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের কর্মপন্থার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা অব্যাহত থাকে।

৩.২ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগের ভূমিকা

১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের ১৯ জন মুসলমান ও হিন্দু সভ্য সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এ স্মারকলিপি উপস্থাপনের পর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্মতৎপর হয়ে ওঠে।[২৬] ১৯১৬ সালের ১৭ ও ১৮ ই নভেম্বর মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সংস্কার কমিটিদ্বয় হিন্দু ও মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এক বৈঠকে মিলিত হয়। তাঁরা যৌথভাবে একটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার পরিকল্পনা রচনা করে। এর পরের মাসে ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর লক্ষ্মৌতে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের নবম বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত পরিকল্পনাটি উত্থাপন করা হয়।[২৭] ঐ অধিবেশনে আব্দুর রসুল, মৌলভী আবুল কাশেম, মাওলানা আকরাম খান, এ.কে. ফজলুল হক প্রমুখ বাংলার মুসলিম রাজনীতিকগন অংশগ্রহণ করেন।[২৮] আব্দুর রসুল ঐ অধিবেশনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সংস্কার কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনাটি প্রস্তাবাকারে উত্থাপন করে বলেন যে, "নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তার সংস্কার কমিটি প্রণীত ও কাউন্সিল অনুমোদিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কার পরিকল্পনাটি এ উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে একযোগে সরকারের কাছে দাখিল করছে; যাতে মহাযুদ্ধ অবসানের পর ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপরূপে তা প্রয়োগ করা হয়"।[২৯]

আব্দুল রসুলের প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে এ.কে. ফজলুল হক বলেন যে, "ভারতের সকল সম্প্রদায়ই হোমরুল চায়। হিন্দু, খ্রিষ্টান, জৈন, পার্সী সকলেই তা চায়। তাহলে মুসলমানরা তা কেন চাইবে না? যদি তাঁরাও সমভাবে তা চায় তবে এ বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই।"[৩০] ফলে আব্দুর রসুলের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কংগ্রেস অধিবেশনও এ সময় অনুরূপ প্রস্তাব লাভ করে, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত এ যুক্ত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই 'লক্ষ্মৌ চুক্তি' (Lucknow Pact) নামে

অভিহিত। এ চুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেস মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি স্বীকার করে নেয় এবং এতে মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলির আইন সভায় মুসলমানদের প্রভাব সংরক্ষণের (Weightage) ব্যবস্থা রাখা হয়। বিনিময়ে মুসলিম লীগও পাঞ্জাবে ৫০% ও বাংলার আইন সভায় ৪০% আসন গ্রহণে সম্মত হয়ে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐ প্রদেশ দুটিতে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবি প্রত্যাহার করে নেয়। চুক্তি অনুযায়ী বাংলার মুসলমানদের জন্য শতকরা ৪০টি আসন নিয়ে শতকরা ৪টি আসন বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়। এদের লোকসংখ্যা ও অতিরিক্ত আসন ব্যবস্থা ছিল নিম্নরূপ:

প্রদেশ	মুসলমানদের সংখ্যা(%)	আসন(%)
যুক্তপ্রদেশ	১৪	৩০
মধ্যপ্রদেশ	৪	১৫
মাদ্রাজ	৭	১৫
বোম্বাই	২০	৩৩
বিহার	১৩	২৯

'লক্ষ্মৌ প্যাক্ট' ছিল মুসলিম লীগ ও বাংলার মুসলিম রাজনীতিকদের জন্য একটি বড় সাফল্য। এর ফলে বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সহযোগীতা ও ঐক্যমতের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মুসলিম রাজনীতিকদের মতে এ চুক্তির ফলে প্রাদেশিক আইন সভার মুসলমানরা স্পষ্টতই বেশী আসন লাভ করবে। কেননা ১৯০৯ সালে সংস্কার আইনে বাংলার মুসলমানরা যেখানে প্রাদেশিক আইনসভায় ১১.৩০% আসন লাভ করে সেখানে 'লক্ষ্মৌ চুক্তির' মাধ্যমে মুসলমানরা আইন সভায় ৪০% আসন লাভ করবে।[৩১]

বাংলার বিভিন্ন মুসলমান পত্র পত্রিকাতেও 'লক্ষ্মৌ প্যাক্ট' প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়। বাংলার মুসলিম রাজনীতিকদের মুখপত্র 'দি মুসলমান' ও সাপ্তাহিক 'সোলতান' পত্রিকা দুটি 'লক্ষ্মৌ প্যাক্ট' কে স্বাগত জানায়। সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকাটি 'লক্ষ্মৌ প্যাক্টে'র প্রশংসা করে

এবং ভবিষ্যতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মাতৃভূমির কল্যাণ সাধনে একযোগে কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করে।[৩২] কিন্তু বাংলার মোট জনসংখ্যার ৫২.৬% যেখানে মুসলমান সেখানে তাদের জন্য আইন সভায় ৪০% আসন করে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকরা উদরতার পরিচয় দিলেও বাংলার রক্ষণশীল ও রাজানুগত মুসলমানরা সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে এর তীব্র বিরোধিতা করেন। এতদসত্ত্বেও ১৯১৭ সালের ৮ই এপ্রিল বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে লক্ষ্মৌ প্যাক্টের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।[৩৩] ফলে এর প্রতিবাদে রক্ষণশীল নেতা নওয়াব আলী চৌধুরী মুসলিম লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' এ যোগদান করেন।

লক্ষ্মৌ প্যাক্টের প্রতি বাংলার রক্ষণশীল মুসলমানদের বিরোধী মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলার উদারপন্থী মুসলিম রাজনীতিকগণ বরিশালে প্রাদেশিক লীগ অধিবেশনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলার মুসলমানদের জন্য লক্ষ্মৌ প্যাক্টের বর্ণিত হার অপেক্ষা আরও বেশি প্রতিনিধিত্ব দানের জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতি আহবান জানান।[৩৪] তাছাড়া বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ঐ অধিবেশনের সভাপতি মৌলভী আবুল কাশেম বাংলার মুসলমানদের জন্য সরকারী চাকরীর শতকরা ৫০% সংরক্ষণ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য সরকারের কাছে আহবান জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৩৫] তাঁর এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯১৭ সালের ৩১ জুলাই বাংলার প্রখ্যাত মুসলিম রাজনীতিক নেতা আব্দুর রসুল মৃত্যুবরণ করলে বাংলার রাজনীতিতে বড় ধরনের আঘাত লাগে এবং অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। মৃত্যুকালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।[৩৬]

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের দশম অধিবেশন ১৯১৭ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে মাওলানা মুহাম্মদ আলীর[৩৭] সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাকে অন্তরীণাবদ্ধ করায় তিনি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে পারেননি।

এজন্য সভাপতির আসন শূন্য রাখা হয়।[৩৮] এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে 'মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা' ঘোষণা করা হয়। এ পরিকল্পনার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ভারত শাসন আইন' প্রণীত হয়। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই এ আইন প্রত্যাখান করে। এতে পূর্বেকার পরামর্শ সভার পরিবর্তে সংসদীয় কাঠামোর জন্য প্রস্তাব করা হলেও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ যেমন-বাংলায় স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এ সিদ্ধান্ত বাংলার সকল শ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। বাংলার মুসলমানদের বিভিন্ন পত্রিকায় এ সংস্কার পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগও এ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারকে মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে নিন্দা জানায়।[৩৯]

ইতোমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হলে বৃটেন ও তার মিত্ররা তুর্কী সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করার আয়োজনে লিপ্ত হয়। এতে তুরস্কের খলীফা ও পবিত্র স্থান সমূহের নিরাপত্তার কথা ভারতের অন্যান্য অংশের মত বাংলার মুসলিম রাজনীতিকদেরও উদ্বিগ্ন করে তোলে। খিলাফতের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ভারতের বিভিন্ন অংশে মুসলমানরা সংগঠিত হতে শুরু করলে বাংলার মুসলিম রাজনীতিকরা জনমত সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে সমগ্র ভারত ব্যাপী খিলাফত আন্দোলনের সূচনা হয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে, ১৯১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর দিল্লিতে মুসলিম লীগের একাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে বাংলার মুসলিম নেতা ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর ভাষণে তুর্কী সাম্রাজ্যকে খন্ডিত করার প্রয়াসে গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করেন।[৪০] তিনি তাঁর অভিভাষণে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে একথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, "All questions relating to the khilafat and the protection of our holy places are intimately bound up with the vital articles of our faith ... We are loyal subjects of the rulers, and are prepared to prove our loyalty in actual practice by making sacrifices. But this temporal

loyalty is subject to the limitation imposed by our undoubted loyalty to our faith."[৪১]

ব্রিটিশ শাসনে কিভাবে পূর্ববাংলা শোষিত হয়েছে এবং এই ঐশ্বর্যশালী প্রদেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির সর্বনাশ হয়েছে তা ফজলুল হক তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন। তিনি দেশের স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন এবং হিন্দু মুসলমান সহযোগীতার উপর জোর দেন। ব্রিটিশ শাসকদের গর্বের কথা উল্লেখ করে তিনি তাদেরকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের অস্ত্র আইন, ভারত রক্ষা আইন ও সংবাদপত্র আইনের সমালোচনা করেন। দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রচলনের দাবি করে লীগ অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ হয়। তুরস্কের অখন্ডতার ব্যাপারে মুসলমানদের মনোভাব ব্যক্ত করেও একটি প্রস্তাব পাশ হয়।[৪২]

১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে (Peace Conference) বৃটেনের নেতৃত্বে মিত্রশক্তি তুর্কী সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ভারতের মুসলমানরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। খিলাফতের পক্ষে বাংলার মুসলমানদের জনমতকে সংগঠিত করার জন্য এ.কে. ফজলুল হক, মাওলানা আকরাম খান, মৌলভী আবুল কাশেম, মৌলভী মুজিবর রহমান প্রমুখ বাংলার মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ উদ্যোগী হয়ে ১৯১৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় এক সভার আয়োজন করেন।[৪৩]

তুরস্কের খিলাফত ও খলীফার ভাগ্য সম্পর্কে মুসলমানরা যখন উৎকণ্ঠিত ঠিক সে সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য ১৯১৯ সালের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে দমনমূলক 'রাওলাট বিল' ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করলে সমগ্র দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ভারতীয় সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯১৯ সালের ২৮ ই মার্চ বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় অনুমোদিত হয়ে আইনে পরিণত হয়। ফলে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং 'রাওলাট আইন' বাতিলের

জন্য জোর আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল মাইকেল ও ডায়ারের নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব সরকার জালিয়ানওয়ালাবাগে অনুষ্ঠিত 'রাওলাট আইন' বিরোধী এক জনসভার উপর গুলিবর্ষণ করলে সহস্রাধিক লোক নিহত হয়। এ বর্বরোচিত ঘটনা ভারতের সকল শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে।[৪৪] এ ঘটনার তদন্তের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে কমিটি গঠন করে তাতে বাংলার নেতা এ.কে. ফজলুল হকও অন্তর্ভুক্ত হন।

এসময় খিলাফত এবং খলীফার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সংগঠিত করে একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ কাউন্সিল এক সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনের আহ্বান জানায়।[৪৫] ১৯১৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর মাওলানা আব্দুল বারী ও ইব্রাহীম হারুন খান জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় চারশত প্রতিনিধি ও কয়েক হাজার মুসলমান অংশগ্রহণ করেন।[৪৬] বাংলা থেকে ঐ সম্মেলনে এ.কে. ফজলুল হক, বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাশেম ও মৌলভী মুজিবর রহমান প্রমুখ মুসলিম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধিত্ব করেন।[৪৭] সম্মেলনে ১৯১৯ সালের ১৭ই অক্টোবর খিলাফত দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে হিন্দুদের সমর্থন আদায়ের জন্য আহবান জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। সর্বোপরি ঐ সম্মেলনে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বোম্বেকে কেন্দ্র করে সকল প্রদেশে এর শাখা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।[৪৮]

সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯১৯ সালের ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার সারা ভারতে হরতালসহ প্রথম 'খিলাফত দিবস' পালিত হয়। বিকালে কলকাতায় টাউন হলে মুসলমানদের এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ জনসভায় বাংলার নেতা এ.কে. ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৯ সালের ২৩ ও ২৪শে নভেম্বর দিল্লিতে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে প্রায় তিনশত প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এবং এ.কে. ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন। ঐ দিনের সভায় তুরস্কের প্রতি ন্যায় আচরণ

না করা পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের প্রস্তাবিত শান্তি উৎসব[৪৯] বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া খিলাফত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা না হলে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন এবং সরকারের সাথে অসহযোগ নীতি অনুসরণ করে চলার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। সভায় খিলাফত বিষয়ক একটি প্রতিনিধিদল ইংল্যান্ডে প্রেরণ করার সিদ্ধান্তও অনুমোদিত হয়।[৫০] সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি খিলাফত প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান এবং জালিয়ানওলাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সরকারের সাথে অসহযোগীতা করারও প্রস্তাব করেন।[৫১] তিনি তাঁর ভাষণে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং খিলাফত আন্দোলনে মুসলমানদের সাথে সহযোগীতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।[৫২]

১৯২০ সালের প্রথমদিকে বাংলার মুসলিম রাজনীতিকগণ বাংলায় সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির প্রাদেশিক শাখা স্থাপনে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের উদ্যোগেই গঠিত হয় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটি'। মাওলানা আব্দুর রউফ এর সভাপতি, মাওলানা আকরাম খান সাধারন সম্পাদক এবং মৌলভী মুজিবর রহমান সহ সম্পাদক নিযুক্ত হন। কলকাতার কলুটোলা স্ট্রীটের হিরণবাড়ী লেনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির সদর দফতর স্থাপন করা হয়।[৫৩] এরপর ১৯২০ সালের ২৮ ও ২৯ শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির উদ্যোগে কলকাতার টাউন হলে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে এ.কে. ফজলুল হক সহ সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতা অংশগ্রহণ করেন।[৫৪] ঐ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খিলাফত সংক্রান্ত মুসলমানদের দাবি দাওয়া যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারের সাথে অসহযোগ নীতি অনুসরণ করবে। এছাড়া বিলাতী পণ্য বর্জন এবং ১৯শে মার্চ সমগ্র দেশব্যাপী হরতাল সহ খিলাফত দিবস পালন করার পক্ষেও সম্মেলনে মত প্রকাশ করা হয়।[৫৫]

এসময় সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়। এতে বাংলার মুসলিম নেতা মৌলভী আবুল

কাশেমও অন্তর্ভুক্ত হন। ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত করাই প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য ছিল।[৫৬] বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত সম্মেলনের পরপরই ১৯২০ সালের ৩রা মার্চ প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকার আহসান মঞ্জিলে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ঐ সভা কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাদি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে। মাওলানা আকরাম খান, মাওলানা মনিরুজ্জামান খিলাফত আন্দোলনে অসহযোগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বাংলা ভাষায় তেজদীপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন।[৫৭] ১৯শে মার্চ বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে যথাযোগ্য মর্যাদায় শান্তিপূর্ণ ভাবে ভারতের সর্বত্র হরতাল সহ দ্বিতীয় খিলাফত দিবস পালন করা হয়। সবচেয়ে বড় জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয় টাঙ্গাইল জেলায়। টাঙ্গাইল পার্কে আয়োজিত ঐ সভায় প্রায় ৫০ হাজার লোকের সমাগম হয়। বাংলার মুসলিম রাজনীতিক নেতা আব্দুল হালিম গজনভী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ঐ সভায় তাঁর ভাষণে মহাত্মা গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ নীতি'[৫৮] (Gandhian Method of Satygraha) কে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রতীকরূপে গ্রহণ করার পক্ষে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন।[৫৯]

ইতোপূর্বে ১৯২০ সালের ৯ই মার্চ মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ মেনিফেস্টো প্রকাশ করেন। ১৭ই এপ্রিল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির অধিবেশনে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে অসহযোগের পূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।[৬০] এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯২০ সালের ১৪ই মে তুরস্কের সাথে মিত্রপক্ষের সম্পাদিত শান্তিচুক্তির শর্তবলী প্রকাশিত হলে মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব চরম আকার ধারণ করে। এ প্রেক্ষাপটে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির উদ্যোগে ১৯২০ সালের ১লা ও ২রা জুন এলাহাবাদে হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক যৌথ সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় অসহযোগ কর্মসূচীকে চারটি স্তরে বিন্যস্ত করে আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই ১৯২০ সালের ১লা আগষ্ট হরতাল সহ তৃতীয় খিলাফত দিবস পালন করা হয়। ১৯২০ সালের ১০ই আগষ্ট তুরস্ক মিত্রপক্ষের সাথে অপমানজনক সেভার্স (Sevres) চুক্তি

স্বাক্ষর করলে খিলাফতের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। ফলে স্বভাবতই ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ আরও চরম আকার ধারণ করে এবং এর প্রতিবাদে ৩১শে আগষ্ট সারা ভারতে আরো একটি খিলাফত দিবস পালন করা হয়।[৬১]

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি ও জমিয়ত-এ-ওলামা-এ-হিন্দ এর বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ অধিবেশনে গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হলে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সম্মিলিত রূপ পরিগ্রহ করে।[৬২] এর ফলে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের আন্দোলন নব উদ্দীপনায় শুরু হয় এবং পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা শহরে মুসলমান ছাত্ররা ব্যাপক সংখ্যায় এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সম্মিলিত আন্দোলন গান্ধী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের (মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী) নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং স্বরাজ এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল।[৬৩]

অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনে সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের কর্মসূচীর সাথে বাংলার মুসলিম রাজনীতিক নেতা এ.কে. ফজলুল হক একমত হতে পারেন নি। তিনি স্কুল কলেজ বয়কট করার বিরোধী ছিলেন। মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে বহু পিছনে পড়েছিল। তাঁর মতে, এ অবস্থায় তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট করলে তাদের অপূরনীয় ক্ষতি হবে। ১৯২০ সালের ১২ই ডিসেম্বর ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে চিত্তরঞ্জন দাস এক বক্তৃতায় ছাত্রদের স্কুল কলেজ বয়কট করতে উপদেশ দেন। পরের দিন একই ময়দানে এক বক্তৃতায় ফজলুল হক ছাত্রদেরকে স্কুল কলেজ বয়কট না করতে উপদেশ দেন।[৬৪]

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের এ পর্যায়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি ব্যাপক ভিত্তিক রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠন রূপে আবির্ভূত হয়। তাছাড়া এ সময় ভারতের মুসলমানরা খিলাফত কমিটি সংগঠিত করার বিষয়ে এত অধিক মনোযোগী ছিলেন যে, মুসলিম লীগের অস্তিত্ব একরূপ ম্লান হয়ে আসে।[৬৫] অনেক জেলায় কংগ্রেস অফিসেই খিলাফত কমিটির অফিস স্থাপিত হয়।[৬৬] হিন্দু মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতি এ সময় এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, অনেক মুসলমান নেতা মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন বলেও ভাবতে শুরু করেন।[৬৭] ফলে এ সকল কারণে ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগও তেমন সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেনি।[৬৮]

অসহযোগ আন্দোলনের চরম মুহূর্তে ১৯২১ সালের ১৮ই নভেম্বর ইংল্যান্ডের যুবরাজ ভারত সফরে আসেন। ভারতবাসী তার আগমনকে স্বাগত না জানিয়ে অসহযোগের অংশ হিসেবে ঐ দিন ভারতের সর্বত্র হরতাল পালন করে। সরকার ঐ কর্মসূচীকে বানচাল করার জন্য বিশিষ্ট মুসলিম রাজনীতিকদের কারারুদ্ধ করে।[৬৯] এতদসত্ত্বেও সরকার অসহযোগ আন্দোলনের গতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন কারণে অসহযোগ আন্দোলনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে মালাবারের মোপলা মুসলমানদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। যুক্ত প্রদেশের চৌরিচৌরায় এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। জনতা একটি পুলিশ থানায় আগুন জ্বালিয়ে দিলে ২২ জন পুলিশ মারা যায়। এ ঘটনায় গান্ধী মর্মাহত হন এবং অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বেই আন্দোলন বন্ধ করে দেয়ায় আলী ভ্রাতৃদ্বয় নিরাশ হলেও খিলাফত আন্দোলন চালিয়ে যান। কিন্তু ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ কামাল আতাতুর্ক রাজতন্ত্র ও খিলাফতের বিলোপ সাধন করলে ভারতীয় মুসলমানদের আগ্রহেও ভাটা পড়ে এবং অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে।[৭০]

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। কিছুকাল মন কষাকষির পর আবার বাংলার হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগীতার মনোভাব প্রকাশ পায়। উদারচিত্ত রাজনীতিক

Dhaka University Institutional Repository

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ফজলুল হক ও এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দীর সাথে বাংলার রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। কিন্তু সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য নেতাদের সাথে তাঁর মতানৈক্য হয় এবং ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহেরুর সমর্থন লাভ করে 'স্বরাজ পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।[৭১] এরপর তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। অল্পদিনের মধ্যে স্বরাজ পার্টির সভ্যগণ বাংলা প্রদেশিক কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসু যথাক্রমে এর সভাপতি ও কর্মসচিব নির্বাচিত হন।

চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তিনি উপলব্ধি করেন যে, স্বরাজ দলের কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে হলে মুসলমান সম্প্রদায়ের সহযোগীতা অপরিহার্য।[৭২] তাই তিনি স্বরাজ দলের কর্মসূচীর প্রতি বাংলার মুসলমানদের সমর্থন অর্জনে সচেষ্ট হন এবং মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন।[৭৩] এর ফলশ্রুতিতে হিন্দু-মুসলমান সহযোগীতার বিষয়টি রাজনৈতিকরূপ লাভ করে এবং ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে রচিত হয় ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট'। 'বেঙ্গল প্যাক্টে' সন্নিবেশিত শর্তাবলী মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করায় এ চুক্তি বাংলার মুসলমান সমাজে ব্যাপক সমাদৃত হয়।[৭৪] ফলে ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে মুসলমানদের সহায়তায় স্বরাজ দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[৭৫] ১৯২৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বরাজ দলের কাউন্সিল অধিবেশনে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অনুমোদিত হয়। ১৯২৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অনুমোদন করে।[৭৬] হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ স্বায়ত্তশাসনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করাই এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল। তবে ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের পরে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ নিয়ে বাংলার নেতা এ.কে. ফজলুল হকের সাথে চিত্তরঞ্জন দাসের মতানৈক্য ঘটে। হিন্দু পত্রিকাগুলো বেঙ্গল প্যাক্টের বিরূপ সমালোচনা করে। ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন দাসের অকাল মৃত্যুতে 'বেঙ্গল প্যাক্টের' ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

এবং ১৯২৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল বলে ঘোষণা করে।[৭৭]

৩.৩ ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও মুসলিম লীগের কার্যক্রম

'বেঙ্গল প্যাক্টের' উদ্দেশ্য শেষপর্যন্ত সফল না হলেও দেশের স্বায়ত্তশাসন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই কাম্য ও উদ্দেশ্য ছিল। মুসলিম লীগ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কয়েকটি রক্ষাকবচ দাবী করেছিল। এ রক্ষাকবচের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য মুসলিম লীগ নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সহযোগীতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এ জন্য তাঁকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের দূত বলা হত। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিন বছর তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন এবং ১৯২৪ সালে আবার কংগ্রেস ও লীগের সাথে সংশ্রব স্থাপন করেন।[৭৮]

মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯২৪ সালের ২৪শে মে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের পঞ্চদশ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এ অধিবেশনে লীগের নাগপুর অধিবেশনে গৃহীত স্বরাজ সর্ম্পকীয় কর্মসূচী সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। স্বরাজ সম্পর্কে বলা হয় যে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এতে প্রদেশগুলোতে স্বাধীকার, স্বতন্ত্র নির্বাচন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। মুসলিম লীগের ষষ্ঠদশ অধিবেশন ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে এবং ১৯২৫ সালে লীগের সপ্তদশ অধিবেশন আলীগড়ে অনুষ্ঠিত হয়। দুটি অধিবেশনেই মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে তাদের মধ্যে একতা স্থাপনের উপর জোর দেয়া হয়।[৭৯]

১৯২৭ সালে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নিবাস আয়েঙ্গার মুসলিম লীগের গ্রহণের জন্য পাঁচটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এবং আরো কয়েকজন লীগ নেতা ২০শে

মার্চ দিল্লিতে এক সভায় এ প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা করেন এবং তারা যে কয়েকটি প্রস্তাব রচনা করেন তা 'দিল্লি প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এর মধ্যে যুক্ত নির্বাচনের প্রস্তাবের ব্যাপারে মুসলিম লীগে মতানৈক্য দেখা দেয়। মিয়া মুহাম্মদ শফী এবং আরো কয়েকজন নেতা স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে লীগে দুটি উপদল হয়ে যায়, 'জিন্নাহর দল' ও 'শফীর দল'।[৮০]

১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের অধিবেশনে দিল্লি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৯২৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী দিল্লিতে একটি সর্বদলীয় বৈঠক বসে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, ফজলুল হক এবং আরও কয়েকজন লীগের পক্ষ থেকে বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ মুঞ্জে দিল্লি প্রস্তাবে গৃহীত বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংরক্ষণ এবং বোম্বাই থেকে সিন্ধু প্রদেশের স্বতন্ত্রীকরণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। মে মাসে বোম্বাইতে সর্বদলীয় বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। বৈঠকে অনেক আলাপ-আলোচনার পর শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণের জন্য আইনবিদদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। মতিলাল নেহেরু এই কমিটির সভাপতি এবং এম.এস. অ্যানি, সুভাষচন্দ্র বসু, এম.আর. জয়কার, এন.এম জোর্সী, শোয়েব কুরেশী, আলী ইমাম, তেজ বাহাদুর সাপুর, মঙ্গল সিংহ ও জি.আর প্রধান কমিটি সভ্য নির্বাচিত হন। এটি 'নেহেরু কমিটি' বলে অভিহিত। এ কমিটিতে শোয়েব কুরেশী লীগের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন।[৮১] নেহেরু কমিটি বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের জন্য আইন সভায় আসন সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাহ্য করে এবং কমিটির রিপোর্টে লক্ষ্মৌচুক্তি বাতিল হয়ে যায়; বেঙ্গল প্যাক্ট ও দিল্লি প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে লক্ষ্মৌতে সর্বদলীয় বৈঠকে নেহেরু রিপোর্ট গৃহীত হয়।[৮২]

১৯২৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর কলকাতায় সর্বদলীয় বৈঠক আহুত হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও খিলাফত কমিটির বৈঠকও এ সময় কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় বৈঠকে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী নেহেরু কমিটির রচিত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেন: (১) কেন্দ্রীয় আইন সভায়

মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ আসন দিতে হবে; (২) বাংলা ও পাঞ্জাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার ভিত্তিতে আইন সভায় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে; (৩) শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা থাকবে এবং অতিরিক্ত বিষয়গুলোর ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেয়া হবে। কিন্তু হিন্দু নেতাগণ এ সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হননি।[৮৩] এ.কে. ফজলুল হক, স্যার আব্দুর রহিম, মাওলানা আকরাম খান ও বাংলার অন্যান্য মুসলমান নেতাগণ কমিটির শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন। কংগ্রেস এ পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং প্রস্তাব পাশ করে যে, যদি সরকার ১৯২৯ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে এ পরিকল্পনা কার্যকরী না করে তা হলে সারা দেশে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে।[৮৪]

১৯২৯ সালের জানুয়ারীতে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ দিল্লীতে মুসলিম লীগ পরিষদের সভা আহ্বান করেন এবং সভায় ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁর রচিত ১৪ দফা দাবি গৃহীত হয়। এগুলোর মধ্যে প্রধান দাবিগুলো ছিল: (১) ভারতে যুক্তরাষ্ট্র শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে; (২) প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা থাকবে; (৩) কেন্দ্রীয় আইন সভার আসন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মুসলমানগণ পাবে; (৪) সরকারী চাকরীতে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার থাকবে; (৫) ধর্মীয় বিষয়ে মুসলমানদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।[৮৫]

ইতোমধ্যে আইন সংস্কার সম্পর্কে তদন্তের জন্য ব্রিটিশ সরকার বৃটেনের খ্যাতনামা আইনজীবী জন সাইমনকে সভাপতি করে একটি কমিশন গঠন করে যা 'সাইমন কমিশন' নামে পরিচিত। ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী সাইমন কমিশন ভারতে আসে। এ কমিশনে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি না থাকায় সকল রাজনৈতিক দল তা বয়কট করে। সাইমন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী বড়লাট লর্ড আরউইন কমিশনের সাথে যুক্ত অধিবেশনের জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভার ৭ জন সদস্য মনোনীত করেন। এদের মধ্যে ৩ জন মুসলমান ছিলেন। তাঁরা স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার পক্ষপাতি ছিলেন। [৮৬]

১৯৩০ সালে 'সাইমন কমিশন' রিপোর্ট প্রকাশ করে। সাইমন কমিশন রিপোর্টে শাসনতন্ত্র বিষয়ে যে সব সুপারিশ করা হয় তা কোন রাজনৈতিক দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে দেশে বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে এবং ১৯২৯ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে পুলিশ ও জনতার মধ্যে প্রচন্ড সংঘাত ঘটে। বাংলার হিন্দু জনগণও এ আন্দোলনে অংশগ্রহন করে। যদিও এ আন্দোলনের ব্যাপারে মুসলিম লীগ তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেনি, মুসলমানরা বরং জিন্নাহর ১৪ দফাকে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে বিবেচনা করে।[৮৭] এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩০ সালের নভেম্বরে হিন্দু-মুসলমান নেতাদের শান্ত করার প্রচেষ্টায় লন্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠকের আহবান করেন। ১২ই নভেম্বর প্রথম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের ৫৭ জন প্রতিনিধি এ বৈঠকে যোগদান করেন। আগা খান, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, ফজলুল হক এবং আরও কয়েকজন মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন। ফজলুল হক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার পক্ষে জোরদার বক্তৃতা দেন।[৮৮] হিন্দু মুসলমান ও শিখদের সম্পর্কীয় সমস্যার মীমাংসা না হওয়ায় ১৯৩১ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী গোলটেবিল বৈঠক মূলতবী করা হয়।[৮৯]

১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে। মহাত্মা গান্ধী এ বৈঠকে যোগদান করেন। এ বৈঠকেও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে মতানৈক্য হয়। এরপর ১৯৩২ সালের ২রা আগষ্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এটি 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (Communal Award) নামে অভিহিত। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা স্বীকার করা হয় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আইন সভায় আসন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। বাংলার মুসলমানদের শতকরা ৪৮.৪, হিন্দুদেরকে ৩৯.২ এবং ইউরোপীয়দেরকে শতকরা ১০টি আসন দেয়া হয়।[৯০] ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক আহুত হয়। এ বৈঠকেও সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র রচনার প্রচেষ্টা দুরাশা বলে মনে হয়। এরপর ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে।[৯১]

Dhaka University Institutional Repository

সাইমন কমিশনের সুপারিশ এবং তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার একটি 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে। এ শ্বেতপত্রের প্রস্তাব বিবেচনা করে নতুন শাসন সংস্কার প্রবর্তনের জন্য লর্ড লিনলিথগোর সভাপতিত্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ থেকে কিছু মনোনীত সদস্য নিয়ে যৌথ সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩৪ সালের ২২ নভেম্বর এ কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। যদিও পার্লামেন্টারি কমিটি শ্বেতপত্রে উল্লেখিত কোন প্রস্তাব পরিবর্তন করেনি, কিন্তু প্রাদেশিক ও ফেডারেল আইন পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করে। এ সুপারিশের ভিত্তিতে ভারত শাসন বিল প্রণীত হয় এবং এ বিল পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পাশ হলে অবশেষে ১৯৩৫ সালের ২ অগাষ্ট ভারত শাসন আইন কার্যকর হয়।[৯২] সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন, কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত, মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, নতুন প্রদেশ সৃষ্টি, প্রাদেশিক গভর্নরের ক্ষমতা নির্ধারণ, রাজ প্রতিনিধির পদ সৃষ্টি ইত্যাদি ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য ছিল।[৯৩]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনও কোন রাজনৈতিক দলকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। সম্প্রদায়গত নির্বাচন স্বীকৃতি দিলেও এ আইন মুসলিম লীগ সমর্থন করেনি। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এ আইন সম্পর্কে বলেন, "the scheme of 1935 thoroughly rotten fundamentally bad and totally unacceptable."[৯৪] ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগের বোম্বাই অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সৈয়দ ওয়াজির হাসান এ আইনকে 'গণতন্ত্র বিরোধী' বলে অভিহিত করেন। তবে অধিবেশনে এ আইনের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থাকে আপাতত গ্রহনযোগ্য বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।[৯৫] কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও এ আইনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু ১৯৩৫ সালের আইনকে "A new charter of slavary" বলে অভিহিত করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এ আইনের বিরোধীতা করলেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে

তুলনামূলকভাবে এটি সফলতা অর্জন করে এবং এ আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে উভয়দলই অংশগ্রহণ করে।[৯৬]

তথ্যনির্দেশ

১। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ শে ফালগুন ১৩১৮, ১০ মার্চ ১৯১২।

২। Matiur Rahman, From Consultation to confrontation: A study of the Muslim League in British Indian Politics (1906-1912), London, 1970, P: 67.

৩। Ibid.

৪। Harun-or-Rashid, The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics (1906-1947), The University Press Limited, Dhaka, 2003, P: 12.

৫। Chandiprasad Sarkar, The Bengali Muslims: A Study in their Politicization (1912-1929), Calcutta, 1991, P: 44.

৬। Matiur Rahman, op. cit., P: 246.

৭। Ibid., P: 256.

৮। ওয়াজির হাসান (১৮৭৪-১৯৪৭) আলীগড় ও এলাহাবাদের মুইর কলেজে অধ্যায়ন শেষে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ১৯১০ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত তিনি মুসলিম লীগের সহকারী সচিব এবং ১৯১২ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের কর্মসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। সূত্রঃ Mushirul Hasan,

Nationalism and Communal Politics in India (1916-1928), New Delhi, 1979, P: 327-328.

৯। Matiur Rahman, op. cit., P: 256.

১০। Sharifuddin Pirzada, Foundations of Pakistan: All India Muslim League Documents (1906-1947), Vol. 1, Karachi, 1969, P: 258.

১১। Ibid., P: 279

১২। Ibid.

১৩। Harun-or-Rashid, op.cit., P: 15.

১৪। মুজিবর রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, মাসিক মোহাম্মদী, ১৩শত বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য, ১৩৪৭, পৃ: ৫৬৫।

১৫। Mushirul Hasan, op. cit., P: 82.

১৬। এম.এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), চতুর্থ প্রকাশ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ: ১৭৭।

১৭। J. H. Broomfield, Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth Century Bengal, USA, University of California Press, 1968, P: 64.

১৮। Ibid.

১৯। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

২০। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 17.

২১। Ibid.

২২। Bazlur Rahman Khan, Politics in Bengal (1927-1936), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987, P: 200.

২৩। S. Pirzada, op. cit., P: 347.

২৪। সৈয়দ মুর্তাজা আলী, মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬, পৃঃ ১০৯।

২৫। The Bengalee, Calcutta, Tuesday April 25, 1916.

২৬। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৯।

২৭। S. Pirzada, op. cit., P: 379.

২৮। Chowdhury Khaliquzzaman, Pathway to Pakistan, Lahore, 1961, P: 37.

২৯। S. Pirzada, op. cit., P: 379.

৩০। Ibid., P: 380.

৩১। Chandiprasad Sarkar, op. cit., P: 74.

৩২। Ibid., P: 74.

৩৩। Ibid., P: 75.

৩৪। Ibid.

৩৫। Mrinal Kumar Basu, op. cit., P: 302.

৩৬। সৈয়দ মুর্তাজা আলী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১০।

৩৭। মাওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩১) 'মহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' এবং অক্সফোর্ড এ অধ্যয়ন শেষে রামপুরা শিক্ষা বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন। কানপুর মসজিদকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট আন্দোলন এবং প্যান-ইসলামী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৯ সালে তিনি ইউরোপে খিলাফত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং রাজদ্রোহিতার অভিযোগে ১৯২০ সালে কারারুদ্ধ হন। ১৯২১-১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি ১৯২৮ সালে নেহেরু রিপোর্টের বিরোধিতা করেন। ১৯৩০-১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকেও যোগদান করেন। সূত্রঃ Mushirul Hasan, op. cit., P: 320-321.

৩৮। J. H. Broomfield, op. cit., P: 124.

৩৯। Chandiprasad Sarkar, op. cit., P: 79.

৪০। S. Pirzada, op. cit., P: 476.

৪১। Ibid., P: 497.

৪২। Ibid., P: 474.

৪৩। Mushirul Hasan, op. cit., P: 153.

৪৪। মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ: ২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। Gail Minault, The Khilafat Movement: Religious Symbolism and Political Mobilization in India, Oxford University Press, Delhi, 1982, P: 24.

৪৬। Ibid., P: 75.

৪৭। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাঙলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ৬।

৪৮। Gali Minault, op. cit., P: 76.

৪৯। ভার্সাই স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির মাধ্যমে মিত্র শক্তি যে বিজয় অর্জন করে সে উপলক্ষে ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্যের সর্বত্র ১৯১৯ সালের ১৩ থেকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সূত্রঃ A.S.M. Abdur Rab, A.K. Fazlul Haq: Life and Achievements, Barisal, 1966, P: 60.

৫০। Mushirul Hasan, op. cit., P: 159

৫১। ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ৩০ শে নভেম্বর, ১৯১৯, পৃঃ ৪।

৫২। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

৫৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

৫৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১, Mushirul Hasan, op.cit., P: 161.

৫৫। ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ১৪ই মার্চ, ১৯২০, ১লা চৈত্র, ১৩২৬ বাং, পৃঃ ৫।

৫৬। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১-১২।

৫৭। আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৪।

৫৮। রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমতকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী ১৯১৯ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে 'সত্যাগ্রহ সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এ সভার প্লাটফর্ম থেকেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে সত্যের অনুসরণ এবং মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি সাধন হতে বিরত থাকার শপথ গ্রহণ করতে হত। সূত্র: সৈয়দ মকসুদ আলী, রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ:৯৬।

৫৯। Chandiprasad Sarkar, op. cit., P: 94.

৬০। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩।

৬১। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ: ১৭৭।

৬২। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৯।

৬৩। ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১), বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ: ৮৩।

৬৪। ঢাকা প্রকাশ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯২০ ইং, ৪ঠা পৌষ, ১৩২৭ বাং, পৃ: ৩।

৬৫। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 26.

৬৬। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪১।

৬৭। S. Pirzada, op. cit., P: 556.

৬৮। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 27.

৬৯। Chandiprasad Sarkar, op. cit., P: 121.

৭০। মুহম্মদ এনামুল হক, বাঙ্গালী মুসলিম মানসে তুর্কী বিপ্লবের প্রভাব, ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবন, ১৩৭৫, দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৪।

৭১। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 22.

৭২। J. H. Broomfield, op. cit., P: 238.

৭৩। Shila Sen, Muslim Politics in Bengal (1937-1947), Impex India, New Delhi, 1976, P: 51.

৭৪। ইমরান হোসেন, বাঙ্গালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী, চিন্তা ও কর্ম (১৯০৫-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃঃ ৮৩।

৭৫। Shila Sen, op. cit., P: 53.

৭৬। Ujjal Kanti Das, The Bengal Pact of 1923 and its Reactions; Bengal - Past and Present, vol. xcix, Part 1, 1980, P: 31

৭৭। Ibid., P: 39.

৭৮। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৯।

৭৯। J. H. Broomfield, op. cit., P: 261.

৮০। এম.এ. রহিম, পূবোক্ত, পৃঃ ১৮৯।

৮১। J. H. Broomfield, op. cit., P: 261.

৮২। Ibid., P: 262

৮৩। Ibid.

৮৪। Ram Gopal, Indian Muslims: A Political History, London, 1959, P: 167.

৮৫। I. H. Qurashi, Struggle for Pakistan; History of the Freedom Movement, 3rd part, 1962, P: 310.

৮৬। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯১।

৮৭। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮।

৮৮। Ram Gopal, op. cit., P: 189.

৮৯। The Statesman, 19 February, 1931, P: 3.

৯০। J. H. Broomfield, op. cit., P: 289.

৯১। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯২।

৯২। বিপুলরঞ্জন নাথ, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ও রাজনীতি, ঢাকা, বুক সোসাইটি, ২০০৩, পৃঃ ১২৭।

৯৩। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২২।

৯৪। The Bengalee, 9 August, 1935, P: 3.

৯৫। R. C. Majumdar, History of the Freedom Movement in India, Vol:III, Calcutta, Firman KLM Pvt. Ltd., 1996, P: 157.

৯৬। বিপুলরঞ্জন নাথ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার রাজনীতিতে কৃষক প্রজা পার্টির ভূমিকা ও মুসলিম লীগের পুনর্জাগরণ (১৯৩৫-১৯৪০)

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৩৫-১৯৪০ সাল ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্ম উপলব্ধির সময়।[১] ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হওয়ার ফলে বাংলার মুসলমান নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়। বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল; ভারত শাসন আইনের বলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুসলমান নেতাগণ এ প্রদেশে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের ও জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির সুযোগ দেখতে পায়। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তাঁদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। এ সময় বাংলায় মুসলিম লীগের অস্তিত্ব নির্জীব হয়ে পড়ে এবং নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[২] বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের কার্যক্রম প্রজা পার্টির নেতাদের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুটি দল কাছাকাছি চলে আসে।[৩]

৪.১ বাংলার রাজনীতিতে এ.কে. ফজলুল হক ও কৃষক প্রজা পার্টির উত্থান

বাংলার রাজনীতিতে কৃষক প্রজা পার্টি সীমিত সময়ের জন্যে হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূলত, কৃষি প্রধান বাংলার কৃষকদের অভাব অভিযোগ থেকে কৃষক প্রজা পার্টির উৎপত্তি হয়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির মালিক হয়েছিল, জমিতে প্রজাদের স্বত্ব ছিলনা এবং প্রজাদেরকে সম্পূর্ণরূপে জমিদারের দয়ার উপর নির্ভর করতে হত। জমিদার প্রজাদের নিকট থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করলে অথবা

তাদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করলেও তারা প্রতিকার করতে পারত না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত অনুযায়ী প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা ও কর বাবদ যে পরিমান টাকা আদায় করার কথা ছিল জমিদারগণ অন্যায় ভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা আদায় করত। এ অর্থ জমিদার ও তাদের আমলাদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হত।[৪]

জমিদারদের অতিরিক্ত খাজনা ও করের ভারে উপায়হীন হয়ে প্রজাগণ মহাজনের নিকট থেকে অতিরিক্ত সুদে টাকা কর্জ করতে বাধ্য হত। এরপর একদিকে জমিদার ও অন্যদিকে মহাজন এই দুয়ের নিষ্পেষণে প্রজাদের দুর্দশা চরমে পৌঁছে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর সরকার জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে প্রজাদের রক্ষা করার প্রয়োজন অনুভব করে। এ উদ্দেশ্যে ১৮৫৭ সালে 'বঙ্গীয় ভূমিকর আইন' বিধিবদ্ধ হয়; জমিদারের অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য প্রজাদেরকে আদালতের আশ্রয় নেবার অধিকার দেয়া হয়। যদিও এ আইনের দ্বারা প্রজাদের কোন উপকার হয়নি, কারণ গরীব প্রজাদের পক্ষে ব্যয় সংকুল আদালতের আশ্রয় নেয়া সম্ভবপর ছিল না। সৈয়দ আমীর আলী বাংলার ভূমি সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে কৃষকদের দুর্দশার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর বড়লাট লর্ড রিপনের শাসনকালে ১৮৮৫ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল' পাশ হয়। জমিদারগণ সাধ্যমত এ বিলের বিরোধিতা করেছিল।[৫] কিন্তু এই আইনের ফলেও প্রতাপশালী জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিশেষ সুবিধা হয়নি।

১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস এবং ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ কৃষকদের স্বার্থে এবং জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কোন কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। পূর্ববাংলার কৃষকদের অধিকাংশ মুসলমান এবং জমিদার ও মহাজনদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। অবহেলিত ও নির্যাতিত কৃষকদের জমিদারি প্রথা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা এ.কে.ফজলুল হক এগিয়ে আসেন।[৬] বাংলার দুর্দশাগ্রস্থ কৃষকদের জন্য তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। ১৯১৩ সালের নির্বাচনী বক্তৃতায় ফজলুল হক নিজেকে কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য

তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করবেন। তিনি প্রকাশ করেন যে, তিনি নিজে একজন প্রজা এবং জমিদার ও মহাজনদের কবল থেকে প্রজাদের মুক্ত করা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর রাজনৈতিক ব্রত।[৭]

প্রজাদের মধ্যে নিজেদের অধিকারের বিষয়ে আত্মচেতনা উদ্ভব হওয়ার ফলে এবং ফজলুল হক ও অন্যান্য কয়েকজন প্রজাদরদী নেতার উৎসাহ ও উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। জমিদার ও মহাজনদের কবল থেকে প্রজাদের রক্ষা করা এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। ১৯০৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে এ.কে.ফজলুল হক কৃষকদের দুর্দশা উপলব্ধি করে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সংকল্প করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি সরকারী চাকরি থেকে ইস্তোফা দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯১৩ সালে তিনি বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। একই সাথে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক হন।[৮]

১৯১৪ সালের দিকে প্রজা আন্দোলন শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেন। একই বছর জামালপুর মহাকুমার কামারিয়ার চরে এক বিরাট প্রজা সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয়। জামালপুরের খোশ মুহাম্মদ এর আহবায়ক ছিলেন। ফজলুল হক এ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মৌলবী আবুল কাশেম, মাওলানা আকরাম খান, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, বগুড়ার রজীবুদ্দিন তরফদার, প্রমুখ নেতাগণ এ সম্মেলনে যোগ দেন। অতিরিক্ত কর রহিত করা এবং প্রজাদের জন্য কয়েকটি অধিকার দাবি করে সম্মেলনীতে প্রস্তাব পাশ করা হয়।[৯]

১৯১৫ সালে বরিশাল জেলায় কৃষকদের কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার একদল আইনজীবী ও সাংবাদিক ফজলুল হকের নেতৃত্বে কলকাতা কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালের শুরুতে ‘বেঙ্গল জোতদার ও রায়ত

এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। কৃষকরা যে প্রধান ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে এসব সংগঠন গড়ে উঠলে তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পরের বছর ১৯২১ সালে বরিশাল জেলার আগাইলঝড়াতে এক প্রজা সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। খান বাহাদুর হাশিম আলী খান এর সভাপতি ছিলেন। এ সম্মেলনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যোগ দিয়েছিল।[১০] এ বছর ফজলুল হক 'নবযুগ' নামে একটি সংবাদপত্র বের করেন। তিনি মুজাফফর আহমদ ও নজরুল ইসলামকে এর যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত করেন। নবযুগ পত্রিকায় প্রজা-সাধারণের অবস্থা ও অধিকারের বিষয় প্রচার করা হত।[১১]

প্রজা আন্দোলন অচিরেই গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯২৪ সালে ঢাকায় প্রজা সম্মিলনীর অধিবেশন বসে। ফজলুল হক এর সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রজাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য সংঘবদ্ধ হতে উপদেশ দেন। এ সম্মিলনীতেই 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠিত হয় এবং এর কর্মসূচী গৃহীত হয়। নবযুগ পত্রিকাকে এর মুখপাত্র করা হয়। ১৯২৬ সালে প্রজা আন্দোলনের শক্তির পরিচয় ঘটে মানিকগঞ্জ সম্মেলনে।[১২] এভাবে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ফলে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং এর প্রভাবে সরকার ১৯২৮ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' পাশ করে। এ আইনের দ্বারা প্রজাগণ কয়েকটি অধিকার লাভ করে। যদিও এসব আন্দোলন স্বত্বেও ১৯২৯ সালের আগে প্রজাদের কোন শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেনি কিন্তু কৃষক প্রজা সমিতি গঠনের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১৩]

১৯২৯ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর জুলাই মাসের শুরুতে প্রজা সমিতি পার্লামেন্টারি গ্রুপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ৪ জুলাই বঙ্গীয় আইন পরিষদের ২৫ জন মুসলিম সদস্যের এক বৈঠকে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠিত হয়। ১৯২৯ সালের নির্বাচনের পর বঙ্গীয় আইন পরিষদের মোট ৩০ জন মুসলমান সদস্যের মধ্যে ১৮ জনকে নিয়ে এ.কে.ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রজা পার্টি আরো শক্তিশালী হয়। দিল্লিতে জন্মগ্রহনকারী কলকাতার উর্দুভাষী ব্যবসায়ী আবদুর রহিম[১৪] দলের উপনেতা নির্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভায় প্রজা পার্টির অন্যান্য নেতা ছিলেন সম্পাদক তজিমউদ্দিন খান, সহ-সম্পাদক খান

বাহাদুর আজিজুল হক, শাহ আব্দুল হামিদ এবং পার্টির হুইপ ছিলেন ফজলুল্লাহ ও মোহাম্মদ হোসেন।[১৫]

বেঙ্গল প্রজা সমিতি আইন পরিষদের সকল বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে মেনে নেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। স্যার আব্দুর রহিম সমিতির সভাপতি এবং মাওলানা আকরাম খান এর কর্মসচিব নির্বাচিত হন। ফজলুল হক, মুজিবর রহমান, আবদুল করিম, ডঃ আব্দুল্লাহ, সোহরাওয়ার্দী ও খান বাহাদুর আবদুল মোমিন সমিতির সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। শামসুদ্দীন আহমদ ও তমিজুদ্দিন খাঁ এর যুগ্ম কর্মসচিব নিযুক্ত হন। জিলায় জিলায় সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়।[১৬]

১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সিরাজগঞ্জে একটি প্রজা সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী[১৭] সম্মিলনীর উদ্বোধন করেন এবং খান বাহাদুর আব্দুল মোমিন (বর্ধমান) এর সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মিলনীতে বিরাট লোক সমাগম হয় এবং জমিদারী উচ্ছেদ, মহাজনের সুদের হার নির্ধারণ, প্রভৃতি দাবি করে প্রস্তাব পাশ করা হয়। এ সম্মিলনীর ফলে প্রজা সমিতির শক্তি বৃদ্ধি পায়।[১৮] জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হক ১৯৩৪ সালে কুষ্টিয়ায় এবং ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রজা সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন। এসময় জেলার সর্বত্র লোকাল বোর্ড ও জিলা বোর্ডের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে প্রজা সমিতির প্রার্থীরা আশাতীত সাফল্য লাভ করে। ময়মনসিংহ জেলায় ৭২টি আসনের মধ্যে প্রজা সমিতি ৪৪টি আসন দখল করে। সে সময় লোকাল বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যের ভোটে জিলা বোর্ডের সভ্য নির্বাচিত হত। এ নির্বাচনেও প্রজা সমিতি জয়লাভ করে। এর ফলে জিলা বোর্ড প্রজা সমিতির হাতে আসে।[১৯]

১৯৩৫ সালে স্যার আব্দুর রহিম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তিনি নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির পদে ইস্তোফা দেন। মাওলানা আকরাম খান, খান বাহাদুর আব্দুল মোমিনকে সমিতির সভাপতি করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত

নেতৃবৃন্দ প্রজাদরদী ও জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হককে সমর্থন করেন। ফলে ফজলুল হক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।[২০] সমিতির পরবর্তী অধিবেশন ফজুলল হকের সভাপতিত্বে ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সমিতির একদল সভ্য দাবি করেন যে, প্রকৃত কৃষকদেরকে এর সভ্যভুক্ত করা উচিত এবং এর নাম পরিবর্তন করে 'কৃষক প্রজা পার্টি' রাখতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাব পাশ হয় এবং সমিতির নাম কৃষক প্রজা পার্টি রাখা হয়। সম্মিলনীতে কৃষক প্রজা সমিতির আগামী সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য চৌদ্দ দফার নির্বাচনী কর্মসূচী পাশ করা হয়। বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ, মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ, ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন, বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, মন্ত্রিদের বেতন ১০০০ টাকায় হ্রাস, রাজবন্দীদের মুক্তি, ইত্যাদি ১৪ দফায় অন্তর্ভূক্ত ছিল।[২১]

মূলত, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বাংলায় কৃষি বিপ্লব আনায়ন করা কৃষক প্রজা পার্টির উদ্দেশ্য ছিল। এ সমিতিতে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য ছিল, কিন্তু এটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল না।[২২] ফজুলল হক তালুকদার ছিলেন। তা সত্ত্বেও প্রজাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক বজায় রাখেন। প্রজাদের দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য প্রজা পার্টির প্রার্থী রূপে ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে নামার সংকল্প করেন। তাঁর নির্বাচনী ইসতেহার খুব সরল ও সহজ ছিল, একমাত্র বক্তব্য ছিল প্রজাদের জন্য ডাল ভাতের ব্যবস্থা করা।[২৩] নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে প্রজা আন্দোলন খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং জমিদারী উচ্ছেদের জন্য জোর দাবি চলতে থাকে। 'লাঙ্গল যার জমি তার' স্লোগান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কৃষক প্রজা পার্টি 'চাষী' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতো।[২৪]

মূলত, কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের এলিট ও ভদ্রলোকের রাজনীতির বিপরীতে মধ্যবিত্তকে রাজনীতিতে নিয়ে আসে। অর্থনৈতিক ইস্যুকে প্রধান্য দিয়ে দলটি গণমানুষের দলে পরিণত হয়। যদিও এর ফলে হিন্দু ও মুসলমান জমিদাররা এ দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। বাংলার রাজনীতিতে এতে নতুন মেরুকরণ ঘটে। মুসলিম লীগ থেকে

তুলনামূলক অসম্প্রদায়িক নেতৃত্ব যেমন আকরাম খান, মুজিবুর রহমান, শামসুদ্দিন আহমদ সহ অনেকে এ দলে যোগ দেন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় বাংলার নেতৃত্বের সমন্বয়ে দলটি অল্প সময়ে জনগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে কৃষক ও প্রজাদের স্বার্থকে এত গুরুত্বসহ কোনো দল এর আগে বিবেচনা করেনি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়া একমাত্র প্রাদেশিক দল ছিল কৃষক প্রজা পার্টি।[২৫]

৪.২ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও মুসলিম লীগের পুনর্গঠন

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সক্রিয় হয়ে উঠে। কৃষক প্রজা পার্টি নতুন দল হিসেবে অংশ নিলেও ভারতের বড় দল ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের অবস্থান সুদৃঢ় ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে এ দলটির ভূমিকা দলটিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের দলে পরিণত করে। ফলে কেন্দ্রের সাথে বাংলার কংগ্রেসের দুরত্ব ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। তাছারা কৃষক ও প্রজাদের ভাগ্য উন্নয়নে কোনো কর্মসূচি না থাকায় এবং দলে অত্যধিক সম্প্রদায়িকতা বিরাজ করার কারনে অনেক মুসলমান নেতা কৃষক প্রজা সমিতিতে যোগদান করেন।[২৬]

অন্যদিকে মুসলিম লীগ (AIML) প্রতিষ্ঠার পর থেকে কয়েক বছর এ দলের সাংগঠনিক অবস্থা ভালো থাকলেও বঙ্গভঙ্গ রদের পর নবাব সলীমুল্লাহর মৃত্যু এবং নেতৃত্বের সংকটের কারণে ক্রমান্বয়ে দলটি নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। ১৯৩৫ সালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলায়ও মুসলিম লীগ কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল।[২৭] ১৯৩৬ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ লন্ডন থেকে ভারতে ফিরে আসলে নির্জীব মুসলিম লীগকে পুনর্জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনকে সমর্থন করে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুটি দলই ১৯৩৭ সালের প্রদেশিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২৮]

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তৎপর হয়ে উঠে। এমনকি নির্বাচনের গতি প্রকৃতি ও প্রতিনিধি বিষয়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ (AIML) এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের (BPML) সাথে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব শুরু হয়।[২৯] এ পর্যায়ে নির্বাচনে প্রতিযোগীতা করার জন্য বাংলার অভিজাত শ্রেণির মুসলিম নেতাগণ একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফলে ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে তাঁরা কলকাতায় এক সভায় মিলিত হন। এ সভায় নবাব হাবিবুল্লাহ, খাজা নাযিমুদ্দীন, রতনপুরের জমিদার কে. জি. এম. ফারুকী, আজিজুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৩০] ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে প্রতিযোগীতা করার জন্য মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সকল মুসলিম নেতাদের মুসলিম লীগের পতাকাতলে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেন এবং যাতে তাঁরা মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীরূপে নির্বাচনে প্রতিযোগীতা করেন সেরূপ ব্যবস্থা করতে ইচ্ছা করেন। সরকার পক্ষের সদস্যদের সাহায্যে তিনি খুব কৌশলে কেন্দ্রীয় আইন সভায় সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ও প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন গ্রহণ করেছিলেন এবং কংগ্রেস সদস্যদের সাথে যোগ দিয়ে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্র শাসনের অংশটুকু নাকচ করিয়েছিলেন। এর ফলে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন এবং সুনামের সাথে মুসলিম লীগের পুনরুত্থানের কাজে নিয়োজিত হন।[৩১]

মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে ১৯৩৬ সালের প্রথমদিকে বোম্বাই শহরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের এক সভা আহুত হয়। এ সভায় মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সংস্থা (Central Parliamentary Board) গঠিত হয়। জিন্নাহ বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালের ৮ই জুন লাহোরে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সংস্থার প্রথম বৈঠক বসে, বাংলার ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি ও প্রজা পার্টির কোন প্রতিনিধি এ সভায় যোগদান করেননি। উল্লেখ্য যে, ১৯৩২ সালে কলকাতায় 'নিউ মজলিশ পার্টি' নামে মুসলমান ব্যবসায়ী শ্রেণির একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল।[৩২] এ দলের প্রতিনিধি রূপে আব্দুর রহমান সিদ্দিকী

ও এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী লাহোরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সংস্থার বৈঠকে যোগ দেন। লাহোর বৈঠকে লীগের নির্বাচনী ইশতেহার গৃহীত হয়। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকরী করতে সাহায্য করা এবং দেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য চেষ্টা করা মুসলিম লীগের নির্বাচনী কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩৩]

বাংলার মুসলিম রাজনীতির এ সংকটজনক অবস্থায় একটি সমঝোতায় পৌছানোর জন্য ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতার অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নেতা এম. এ. এইচ. ইস্পাহানীর নিমন্ত্রণে মুসলিম লীগের প্রধান মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের একটি দল বাংলায় আসেন।[৩৪] উদ্দেশ্য ছিল বাংলার ভঙ্গুর মুসলিম লীগকে পুনর্গঠিত করা। তিনি ১৮ আগষ্ট কলকাতায় ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি, নিউ মজলিস পার্টি ও কৃষক প্রজা পার্টির সাথে বৈঠক করেন।[৩৫] তাঁর লক্ষ্য ছিল যাতে এসব দল মুসলিম লীগের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। তাঁর লক্ষ্য উভয় কিংবা যেকোন একটি দলের সমর্থন আদায় যাতে ভবিষ্যতে লীগকে বাদ দিয়ে এই দুদলের মধ্যে জোট গঠনের সুযোগ না থাকে। সকল দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বাংলায় মুসলিম লীগের একটি নির্বাচনী সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা হয়।[৩৬] বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নির্বাচনী সংস্থার প্রথম বৈঠকে প্রজা পার্টির প্রতিনিধিদের সাথে অন্যান্য সদস্যদের মতানৈক্য দেখা দেয়।[৩৭] ইস্পাহানী বলেন যে, ফজলুল হক ও তার দলীয় সদস্যগণ বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ এবং অতিরিক্ত কর ব্যতিরেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবি নির্বাচনী কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। অন্য দলের সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি। এজন্য ফজলুল হক ও তার সহচরবৃন্দ লীগ নির্বাচনী সংস্থা থেকে সরে কৃষক প্রজা পার্টির কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে নামতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৩৮]

মুহম্মদ আলী জিন্নাহর মুসলিম লীগ এবং সোহরাওয়ার্দীর ইউনাইটেড মুসলিম লীগের সমন্বয়ে বাংলায় মুসলিম লীগ নতুনভাবে সংগঠিত হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। সোহরাওয়ার্দী দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের

আওতায় নির্বাচন ঘোষণা হলে সাংবিধানিক রাজনীতিতে যোগদানের জন্য দলগুলো মানসিকভাবে প্রস্তুত না হলেও নির্বাচনে অংশ নেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।[৩৯] যদিও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নির্বাচনী সংস্থার অধিকাংশ সদস্য অভিজাত শ্রেণির জমিদার ও ব্যবসায়ী ছিলেন। এর ১৯ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন কৃষক প্রজা পার্টি থেকে নেয়া হয়েছিল। ফজলুল হক প্রকাশ করেন যে, ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির তিনজন প্রতিনিধি নবাব হাবিবুল্লাহ, খাজা নাযিমুদ্দীন ও সাহাবুদ্দীন একই জমিদার পরিবারের লোক এবং অন্য তিনজন প্রতিনিধি এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, স্যার এ. এফ. রহমান ও আকরাম খান শহরের অধিবাসী।[৪০]

১৯৩৭ সালের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার্যত মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিযোগীতায় পরিণত হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রজা পার্টির নেতাগণ কৃষক ও জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং এদের সাথে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তাদের প্রধান নেতা ফজলুল হকের বিপুল জনপ্রিয়তা কৃষক প্রজা পার্টির মূলধন স্বরূপ ছিল।[৪১] অন্যদিকে মুসলিম লীগ জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণির প্রতিষ্ঠান ছিল। জনসাধারণের সাথে তাদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না এবং মাওলানা আকরাম খান ব্যতীত অন্য কোন লীগ নেতা গ্রামের কোন জনসভায় বাংলায় বক্তৃতা করতে পারতেন না। জিন্নাহ তখনও কলকাতা ছাড়া বাংলার অন্যান্য স্থানে ভালভাবে পরিচিত হননি। নির্বাচনের প্রাক্কালে আকরাম খান দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকা বের করেন। মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারকার্যে আজাদ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।[৪২]

১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কৃষক প্রজা পার্টি ফজলুল হককে সভাপতি, শামসুদ্দিন আহমদকে ও পরে রজব আলী তরফদারকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করে পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করে। অন্যদিকে ঢাকার নবাবকে প্রেসিডেন্ট ও সোহরাওয়ার্দীকে সেক্রেটারী করে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন করে। কৃষক প্রজা পার্টি গঠনের পরপরই একটি মৌলিক সংস্কারমুখী আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণ করে। সংসদীয় ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে কৃষি

বিপ্লবই ছিল দলটির প্রধান লক্ষ্য।[৪৩] প্রজাস্বত্ব আইন, জমিদার প্রথা বিলোপ, ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন, পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু সহ কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনী কর্মসূচী হিসাবে ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে 'সকলের জন্য ডাল ভাতের ব্যবস্থা', 'লাঙ্গল যার জমি তার', 'ঘাম যার দাম তার' শ্লোগান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৪৪]

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগও কৃষক প্রজা পার্টির ১৪ দফার পাল্টা ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। তবে বাংলার মুসলমানদের স্বার্থে নির্বাচনের প্রাক্কালে ২৫ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার, মুসলমানদের জন্য চাকরিতে পদ সৃষ্টি, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন, মুসলমানদের ধর্মীয় ও অন্যান্য অধিকার সংরক্ষণ, ইত্যাদি। নির্বাচনী প্রচারণায় মুসলিম লীগকে একমাত্র ইসলামী দল হিসাবে প্রচার করা হয়। স্বয়ং মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এ প্রচারাভিযানে শামিল হন। মুসলিম লীগের নেতারা প্রচার চালান যে, মুসলিম লীগকে ভোট দেয়া মানে ইসলামকে ভোট দেয়া।[৪৫] অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার উগ্র সাম্প্রদায়িকতাও হিন্দু সম্প্রদায়কে আলোড়িত করেনি। হিন্দু সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ আবেদনের কারণে তাঁরা সাফল্য লাভ করে।[৪৬]

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, ২৫০টি মোট আসনের মধ্যে ১১৭টি সংরক্ষিত মুসলিম আসনে মুসলিম লীগ ৩৫, প্রজা পাটি ৩৬, ত্রিপুরা কৃষক সমিতি ৫ এবং স্বতন্ত্র মুসলিম ৪১টি আসন পায়। সাধারণ আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় ৬০টি, বাকি আসন পায় অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। যদিও বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য বরাদ্দকৃত ৪টি আসনসহ মুসলিম লীগ ৩৯টি আসন লাভ করে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের চেয়ে কৃষক প্রজা দল নির্বাচনে ভাল ফল করে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসের একাধিপত্য ছিল এবং মুসলিম লীগের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। কেবল যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ৬৪টি মুসলমান আসনের মধ্যে লীগ ২৬টি আসন লাভ করে।[৪৭]

সারণি-১ঃ বঙ্গীয় বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিম আসনের ফলাফল, ১৯৩৭[৪৮]

দলের নাম	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত শতকরা হার
কৃষক প্রজা পার্টি	৩৬	৩০.৭৬
মুসলিম লীগ	৩৫	২৯.৯১
স্বতন্ত্র (মুসলিম)	৪১	৩৫.০৪
ত্রিপুরা কৃষক সমিতি	৫	৪.২৭
মোট	**১১৭**	**৯৯.৯৮**

প্রজা নেতা ফজলুল হক ও লীগ নেতা স্যার খাজা নাযিমুদ্দীনের মধ্যে নির্বাচনে পটুয়াখালী নির্বাচন কেন্দ্রে যে প্রতিযোগীতা হয় তা থেকে ফজলুল হকের বিপুল জনপ্রিয়তার ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। খাজা নাযিমুদ্দীন তাঁর জমিদারী কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আসনের জন্য প্রার্থী হন। আশা ছিল যে, তিনি সহজেই নির্বাচিত হবেন। ফজলুল হক এ পটুয়াখালীতেই নাযিমুদ্দীনের সাথে নির্বাচনী প্রতিযোগীতায় নেমে পড়েন। নাযিমুদ্দীন তখন গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। এক দিকে ঢাকার নবাব পরিবারের অর্থ, জনবল, প্রভাব প্রতিপত্তি, তার উপর সরকারী প্রভাবও নাযিমুদ্দীনের জন্য কাজ করেছিল।[৪৯] এক বিবৃতিতে ফজলুল হক বলেছিলেন, স্যার নাযিমুদ্দীনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে কার্যত তিনি বাংলার গর্ভনর স্যার জন এন্ডারসনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন।[৫০] গণনেতা ফজলুল হক প্রজাদের হৃদয় জয় করেছিলেন। পটুয়াখালীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাযিমুদ্দীন পরাজিত হন। তিনি মাত্র ৫০০০ ভোট পেয়েছিলেন। ফজলুল হক ১৩০০০ ভোটে নির্বাচিত হন।[৫১]

কৃষক-প্রজার নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে ফজলুল হক ঘোষণা করেন যে, যদি সরকার কৃষকদের দাবি গ্রহণ না করে, তাহলে তিনি বাংলার সরকারী ভবন (Writers Building) লালদীঘিতে নিক্ষেপ করবেন।[৫২] ফজলুল হক আরও একটি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। এইচ.এস.সোহরাওয়ার্দী দুটি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি

নাযিমুদ্দীনের জন্য একটি কেন্দ্র ছেড়ে দেন। ফলে নাযিমুদ্দীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আসন লাভ করেন।[৫৩] প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগ নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে। এ সাফল্যের মূলে ছিল প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থার কর্মসচিব এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দীর কর্মকুশলতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা। তাঁর সাংগঠনিক কৌশল ও নির্বাচনী প্রচারকার্যের ফলে মুসলিম লীগ মুসলমান ছাত্র সমাজের সমর্থন লাভ করে। নির্বাচনের পরে স্বতন্ত্র মুসলিম লীগের কেউ কেউ মুসলিম লীগে যোগ দেয়। এর ফলে ব্যবস্থাপক সভায় লীগের সভ্য সংখ্যা ৫৫ হয়।[৫৪]

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোনে একক রাজনৈতিক দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম না হওয়ায় একটি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের প্রয়োজন হয়। বাংলার গভর্নর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথমে বাংলার সভাপতি শরৎ বসুকে আহবান জানিয়ে সাড়া না পেয়ে ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান।[৫৫] এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী ফজলুল হকের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাঁকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিছু সংখ্যক বর্ণ হিন্দু ও তফসিলি হিন্দু সভ্য ফজলুল হককে সমর্থন করেন। ফজলুল হক প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্যার খাজা নাযিমুদ্দীন, নবাব হাবিবুল্লাহ, এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী, সৈয়দ নওশের আলী, নবাব মোশাররফ হোসেন, স্যার নলিনীরঞ্জন সরকার, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী, স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক ও প্রসন্নসদেব রায়কট সহ মোট ১১ জন সদস্য নিয়ে ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।[৫৬]

সারণি-২: প্রজা-লীগ যুক্ত মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)[৫৭]

নাম	মন্ত্রণালয়
আবুল কাশেম ফজলুল হক	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নলিনী রঞ্জন সরকার	অর্থ মন্ত্রণালয়
খাজা নাজিমুদ্দিন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বিজয় প্রসাদ সিং রায়	রাজস্ব মন্ত্রণালয়
খাজা হাবিবুল্লাহ	কৃষি, শিল্প মন্ত্রণালয়
মহারাজা শীশ চন্দ্র নন্দী	যোগাযোগ ও শ্রম মন্ত্রণালয়
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	বানিজ্য ও বিচার মন্ত্রণালয়
নবাব মোশাররফ হোসেন খান	আইন, বিচার মন্ত্রণালয়
সৈয়দ নওশের আলী	জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রণালয়
প্রসন্নদেব রাইকুট	বন ও আবগারি মন্ত্রণালয়
মুকুন্দ বিহারী মল্লিক	সমবায় ঋন ও গ্রামীণ ঋনপ্রস্তুত মন্ত্রণালয়

প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভায় ৬জন মুসলমান ও ৫জন হিন্দু সদস্য ছিলেন। এদের মধ্যে ৬জন জমিদার, ১জন পুঁজিপতি, ৪ জন আইনজীবি ও রাজনীতিবিদ ছিলেন।[৫৮] বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে মন্ত্রিসভার আদর্শগত অবস্থান ছিল ভিন্ন। প্রথম থেকেই মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বিশেষ করে প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে আদর্শ ও স্বার্থগত দ্বন্দ্ব প্রবল ছিল। মূলত, প্রজা পার্টি ছিল অসাম্প্রদায়িক অন্যদিকে মুসলিম লীগ ছিল সাম্প্রদায়িক ও উচ্চ শ্রেণির দল।[৫৯] ফলে মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার কিছু দিন পরই মন্ত্রিসভার স্থিতিশীলতা ও সংহতির জন্য ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালের ১৫ই অক্টোবর মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তিনি লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এক উদ্দেশ্য নিয়ে যে, "personal loss into political gain."[৬০]

ফজলুল হকের প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। প্রায় দুই শতাব্দীর দূরাবস্থার পর বাংলার মুসলমানগণ আবার তাঁদের রাজনৈতিক প্রাধান্য ফিরে পায়। ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুসলমানদের মনে নিজেদের শক্তি সর্ম্পকে আত্মপ্রত্যয় জন্মে। স্বায়ত্তশাসন কার্যকরী করতে ও আইন সভায় প্রতিপত্তি রক্ষা করার ব্যাপারে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী সুদক্ষ রাজনীতিকের পরিচয় দেন। ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলার স্বায়ত্তশাসন যেরূপ সুন্দরভাবে চলছিল তা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য প্রদেশের নেতারা ফজলুল হকের সাহস ও কর্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করতেন এবং তাঁরা তাঁকে ‘শের-ই-বাংলা’ নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৬১] এসময় পূর্ববাংলাই ছিল বৃটিশ ভারতের মধ্যে একমাত্র প্রদেশ যেখানে মুসলিম লীগের প্রাধান্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তাই বাংলাই ছিল মুসলিম লীগের একমাত্র আশা ভরসার স্থান এবং অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎসস্থল।[৬২]

প্রাদেশিক নির্বাচনের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের (BPML) পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী বাংলার সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লীগের কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে পত্র পাঠান।[৬৩] পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলায় প্রাদেশিক লীগের কার্যক্রম অনেক বছর ধরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল এবং কেন্দ্রীয় লীগের (AIML) সাথেও যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। তাই দলকে পুনরায় সংগঠিত করার জন্য সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহকে কলকাতায় আসার অনুরোধ করেন। ১৯৩৭ সালের ২২ আগষ্ট নবাব ফারুকী[৬৪] কলকাতায় প্রাদেশিক লীগের সাধারণ বৈঠকের আয়োজন করেন। এ বৈঠকে দলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। যার সদস্য ছিলেন মাওলানা আকরাম খান, সৈয়দ বদরুদ্দোজা এবং হাসান ইস্পাহানী।[৬৫] এরপর ১৯৩৭ সালে ১৫-১৭ অক্টোবর লক্ষ্ণৌতে কেন্দ্রীয় লীগের (AIML) অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে দলের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬ অক্টোবর জিন্নাহ বাংলার প্রাদেশিক লীগের পুনর্গঠনের জন্য ২০ সদস্য

বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেন। ফজলুল হক এবং সোহরাওয়ার্দী কমিটির সভাপতি এবং কর্মসচিব নির্বাচিত হন।[৬৬]

প্রাদেশিক লীগের পুনর্গঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জিন্নাহ ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটিও গঠন করেন। সোহরাওয়ার্দীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৩৮ সালের নভেম্বরের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় ওয়ার্কিং কমিটি লীগের শাখা স্থাপন করতে সক্ষম হয়।[৬৭] ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে মুসলিম লীগের পাটনা অধিবেশনে ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ওয়ার্কিং কমিটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়। অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দীর সংগঠন ক্ষমতা প্রশংসিত হয়। ১৯৩৯ সালের ৪-৯ এপ্রিল কলকাতায় ফজলুল হকের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক লীগের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে লীগের প্রকৃত আকৃতি গঠিত হয়। এসময় পুনরায় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয় যার প্রেসিডেন্ট ফজলুল হক, সেক্রেটারী সোহরাওয়ার্দী এবং আকরাম খান ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।[৬৮] অধিবেশনে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ার্কিং কমিটিও গঠিত হয়।[৬৯] এসময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সকল কার্যক্রম সোহরাওয়ার্দীর হাতে চলে আসে। তিনি বাংলাকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আদর্শস্থল বলে আখ্যায়িত করেন। এ সর্ম্পকে তিনি বলেন, ‘‘The Muslims have become League minded. All that is required now is organization.”[৭০]

১৯৩৯ সালের মধ্যে পাবনা, নোয়াখালীর সকল উপ-বিভাগীয় শহরে এবং ঢাকা, চট্রগ্রাম ও ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম লীগের শাখা স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য যে, পাবনা শহরের চৌহালী নামক একটি পুলিশ স্টেশনেই লীগের আটটি শাখা স্থাপিত হয়েছিল।[৭১] তাছাড়া এ সময়ের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী এমন দক্ষ কর্মী নিয়োগ করেন যারা গ্রামাঞ্চলেও লীগের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়। মূলত সোহরাওয়ার্দী ফজলুল হকের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম লীগের পুনর্গঠন কাজে সফল হন। ফলে পুনরায় দলটি বাংলার গৌরবময় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[৭২]

যদি বাংলার মন্ত্রিসভা ও আইনসভায় মুসলিম লীগের অবস্থা ভিন্নরূপ থাকত তবে সর্বভারতীয় লীগ মহলে নিরাশার আবহাওয়া বিরাজ করত। সেক্ষেত্রে ফজুলল হক ও তাঁর প্রজা-লীগ মন্ত্রীসভা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বাংলার কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং প্রদেশে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কয়েকটি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করেছিলেন। বাংলার জনসাধারণের জন্য এ কল্যাণকর ব্যবস্থাগুলোর ফল সুদূর প্রসারী ছিল। দরিদ্র কৃষকদের সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ১৯৩৮ সালে 'বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন' (Bengal Agricultural Debtors Act.) পাশ করেন। এ আইনের বলে বাংলায় ষাট হাজার ঋণ সালিশী বোর্ড (Debt Settelment Board) স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। ভবিষ্যতে যাতে কৃষকগণ মহাজনের কবলে না পড়ে সেজন্য ফজলুল হক মন্ত্রিসভা 'বঙ্গীয় কুসিদজীবী আইন' (Bengal Moneylenders Act) পাশ করেন। এ আইনের দ্বারা সুদের ব্যবসায়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় এবং এর অন্যায় থেকে কৃষকদের রক্ষার ব্যবস্থা হয়।[৭৩]

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং জমির উপর কৃষকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা ফজলুল হকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ১৯৩৮ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন' (Bengal Tanency Amendment Act, 1938) পাশ করেন। এ আইন দ্বারা প্রজাদের উপর জমিদারের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করা হয়।[৭৪] যদিও জমিদারী প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করার পূর্বেই ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে হয়েছিল তবু জমিদারী উচ্ছেদের জন্য তিনি যে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তার ফলেই ১৯৫১ সালে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা 'পূর্ববাংলা জমিদারী দখল আইন' (East Bengal Zamindari Acquisition Bill, 1951) পাশ করে জমিদারী প্রথা বিলোপ করতে বাধ্য হয়।[৭৫]

মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি ফজলুল হকের জীবনের ব্রত ছিল। ১৯৩৭ সালের প্রজা লীগ মন্ত্রীসভা গঠনের পূর্বেও তিনি বাংলার দরিদ্র মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন

স্কুল কলেজ এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর বাংলার কৃষক ও জনসাধারণের শিক্ষার সুবিধার জন্য তিনি অবৈতনিক 'প্রাথমিক শিক্ষা আইন' পাশ করেন। তাঁর মন্ত্রিত্বের আমলে ঢাকার কৃষি কলেজ, বরিশালের চাখার কলেজ, কলকাতায় লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ ও ঢাকার ইডেন গালর্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৬] তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতিরও পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে 'মাধ্যমিক শিক্ষা বিল' প্রণয়ন করেন।[৭৭] সরকারী চাকরীতে মুসলমানদের নিয়োগের ব্যপারেও তিনি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে বিভিন্ন চাকরীর জন্য মুসলমান যুবকরা যোগ্যতা অর্জন করে। সাম্প্রদায়িক হার অনুসারে চাকরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা হওয়ার ফলে সরকারী দফতরগুলোতে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হয়।[৭৮]

ফজলুল হক মন্ত্রীসভার শাসনামলে বাংলার মুসলমানদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে এবং তাঁরা মনে করেন যে, বাংলায় মুসলমান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কংগ্রেস দল নানাভাবে তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৭৯] ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের অধিকারের ব্যাপারেও সচেতন ছিল। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার হয়েছিল সে বিষয়ে ফজলুল হক তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের দুরাবস্থার প্রতি তিনিই প্রথম সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ ব্যাপারে তদন্তের জন্য মুসলিম লীগ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে যার রিপোর্ট থেকে মুসলমানদের প্রতি অন্যায়ের কথা প্রকাশ পায়।[৮০] এসময় ভারত সরকারের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদানের প্রতিবাদে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। এ উপলক্ষে জিন্নাহর নির্দেশে ভারতের মুসলামনগন ১৯৩৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর 'নাযাত দিবস' পালন করে। এসময় ফজলুল হক যে বিবৃতি দেন তা 'কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুরাবস্থা' নামে পুস্তিকার আকারে বের হয়।[৮১]

মুসলিম লীগে ফজলুল হকের যোগদানের পর থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফজলুল হক বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সভাপতি ও এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী কর্মসচিব নির্বাচিত হলে হকের জনপ্রিয়তা ও সোহরাওয়ার্দীর সংগঠন ক্ষমতার ফলে পূর্ববাংলায় লীগ এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, আইন সভার উপনির্বাচনে এর মনোনীত প্রার্থীগণ সব কয়টি আসন দখল করে। এ সময় পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রি সিকান্দার হায়াত খান জিন্নাহর সাথে চুক্তি করেছিলেন যে, ইউনিয়নিষ্ট পার্টিতে থেকেও তিনি ও তাঁর সহযোগীরা মুসলিম লীগকে সমর্থন করবেন।[৮২] এতে ভারতে মুসলিম লীগের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। মুসলিম লীগের একজন প্রখ্যাত নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান এ বিষয়ে বর্ণনা করেন, ‘‘What would have happened if the Punjab and Bengal Premiers had not agreed to come to the rescue of the Muslim League organization in U.P…. Briefly it would have remained merely the Muslim League of the Minority Provinces and in time to come would have had to surrender to the Congress. Sir Sikander and Fazlul Haq saved Muslim India by throwing their full weight at the crucial hour behind the Muslim League.’’[৮৩]

ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বাংলার পল্লী সংস্কারেও ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পল্লী পুনর্গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করা ও প্রচারাভিযানের জন্য জেলায় জেলায় অফিসার ও ৬০০ থানা কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। কৃষি, সেচ, রাস্তা, সেতু ইত্যাদি উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিটি গ্রামের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে মন্ত্রীসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৮৪] এছাড়া ১৯৪০ সালে ‘দোকান কর্মচারী আইন’ পাশ করে হক মন্ত্রীসভা শ্রমিকদের সপ্তাহে একদিন ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করে।[৮৫]

৪.৩ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ও মুসলিম লীগের ভূমিকা

মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে এক প্রসিদ্ধ ঘটনা ছিল মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে ১৯৪০ সালে উত্থাপিত 'লাহোর প্রস্তাব'।[৮৬] ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত সরকারের যুদ্ধ নীতির প্রতি মুসলিম লীগের নীতি নির্ধারণের জন্য ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৮৭] ২২শে মার্চ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং এই দিনেই সভাপতির অধিবেশনে তিনি দ্বি-জাতি তত্ত্ব (Two Nations Theory)[৮৮] ঘোষণা করেছিলেন। অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের প্রায় ৪০০ প্রতিনিধির একটি দল নিয়ে ফজলুল হক মঞ্চস্থলে পৌঁছালে সভায় উপস্থিত সকল প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে 'শের-ই-বাংলা' জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।[৮৯]

২৩শে মার্চ (১৯৪০) মুসলিম লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। চৌধুরী খালিকুজ্জামানসহ আরও কয়েকজন প্রতিনিধি প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[৯০] প্রস্তাবটি উত্থাপনের সময় বিপুল হাত তালির মধ্যে ফজলুল হক বলেন, ".....যদিও বাংলা প্রদেশে আমি যুক্ত মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব করছি তবু আমি প্রথমে মুসলমান এবং পরে বাঙ্গালী। ১৯০৬ সালে বাংলায় প্রথম মুসলিম লীগের নিশান উত্তোলিত হয়েছিল; এখন বাংলার নেতা হিসাবে সেই মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকেই আমি মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করার অধিকার পেয়েছি"।[৯১]

মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "Resolved that, it is the Considered view of this session of the All India Muslim League that no Constitutional pen would be workable in

this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principle viz….that geographically units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute the Independent States in which constituent units shall be autonomous and soverign……. This session further authorise the working committee to frame a scheme of constitution providing for the assumption finally by the respective regions of all power such as defence, external affairs, communications, customs and such other metter as may be necessary."[৯২]

লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম লীগ উত্তর পশ্চিম ভারতের ও পূর্ব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকায় একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি করা করেছিল। এ প্রস্তাবের মধ্যে বাংলার মুসলমানদের আশা আকাঙ্খার স্বপ্ন নিহিত ছিল। ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী লাহোর অধিবেশনে তাঁদের বক্তৃতায় বাঙ্গালী মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবির প্রতিধ্বনি করেছিলেন। এ প্রস্তাবের ফলে বাংলার শিক্ষিত মুসলমান ও ছাত্র সমাজে অভূতপূর্ব জাগরণের সাড়া পড়ে। স্বাধীন আবাসভূমি স্থাপনের প্রত্যশায় তাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। এসময় মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা শীর্ষস্থান দখল করে।[৯৩] কিন্তু পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় লীগের পরিবর্তনশীল নীতি নির্ধারণের কারণে লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতি পরিবর্তিত হয়ে তা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিতি লাভ করে। যদিও লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবে প্রতিফলিত হয়নি তবে এ প্রস্তাবের মধ্যে নিহিত ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ।[৯৪]

একথা অনস্বীকার্য যে, ১৯৩৭ সাল থেকে ফজলুল হক একাধারে প্রজা পার্টি এবং মুসলিম লীগের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। বাংলার মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করলেও এক সময় কৃষক প্রজা পার্টি থেকে তিনি দূরে সরে যান। মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে শামসুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টির বিদ্রোহী অংশের চরম বিরোধীতার সম্মুখীন হয়ে ফজলুল হক তার এককালীন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। প্রজা পার্টির অনেক নেতাই মুসলিম লীগে যোগদান করেন।[৯৫] ফজলুল হকের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী দক্ষতার সাথে মুসলিম লীগের পুনর্গঠনের কাজে সফল হন এবং পুনরায় একে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করেন। ফজলুল হকের সাথে বিভিন্ন মফস্বল শহর ভ্রমনের সময় তাঁর দেয়া বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে মুসলিম লীগের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন।[৯৬] খুলনা বিভাগে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে তিনি বলেন, "There are no more difference, between the two parties (KPP and AIML). Now we have decided to work together…..ours is a completely common aim and ideal. Mr Huq is the President of the Krishak Praja Party as well as the League. So, for the greater interest of the community every muslim should assemble under the banner of the Muslim League". [৯৭]

মূলত, মুসলিম লীগের সমর্থন ছাড়া ফজলুল হকের পক্ষে বাংলার মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না।[৯৮] তাছাড়া ঐ সময়ে লীগের সাম্প্রদায়িক শক্তি ছাড়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকা তাঁর জন্য কঠিন ছিল।[৯৯]

৪.৪ কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের পরিবর্তনশীল নীতি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের কার্যক্রম

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৩৭-১৯৪০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ (AIML) এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের (BPML) মধ্যে দলগত মুলনীতি ছিল এক এবং অভিন্ন অর্থাৎ "Fight for the honour and prestige of the All India Muslim League in Bengal".[১০০] এ মূলনীতির সূত্র ধরে ফজলুল হক বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের যে মহাউপকার করেছেন তা অতুলনীয়। তা সত্ত্বেও কিছু বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় লীগের পরিবর্তনশীল নীতি নির্ধারণকে কেন্দ্র করে লীগের প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে ফজলুল হকের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যে সময়ে বাংলার শিক্ষিত মুসলমান ও ছাত্র সমাজ মুসলিম লীগের নেতৃত্বে অকুণ্ঠ আস্থা স্থাপন করে এবং লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়, ঠিক সে অবস্থায় জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হককে নেতৃত্ব হারাতে হয়।[১০১]

মূলত, জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্য নিয়োগের বিষয় নিয়ে হক-জিন্নাহ মতান্তর প্রকাশ্যে চলে আসে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো বৃটেনের পক্ষে ভারতের যুদ্ধে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। তিনি এ ব্যাপারে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত গ্রহণ করেননি। মুসলিম লীগ ভারত সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকার নীতি অনুসরণ করেছিল।[১০২] ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ সরকার বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদ সম্প্রসারণ ও জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এটি 'আগষ্ট প্রস্তাব' নামে পরিচিত।[১০৩] লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি বোম্বাই শহরে ৩১ আগষ্ট অনুষ্ঠিত সভায় আগষ্ট প্রস্তাব বিবেচনা করে। এ সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, লীগ সভাপতি বড়লাটের কাছ থেকে কিছু বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না নেয়া পর্যন্ত কোন লীগ সভ্য সরকারের কোন যুদ্ধ কমিটিতে যোগদান

করবে না।[১০৪] বড়লাটের কার্যনির্বাহক কমিটি ও জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির গঠন সম্পর্কে লিনলিথগোর ব্যাখ্যা লীগ কর্মকর্তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং এ কারণে লীগ কমিটি ২৮ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগীতা না করার সিদ্ধান্ত বলবৎ রেখে প্রস্তাব পাশ করে।[১০৫] কিন্তু বড়লাট ৩০ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেন এবং এতে বাংলা, আসাম ও পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রিদের অন্তর্ভুক্ত করেন।[১০৬]

জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ বিষয়ে বড়লাটের সিদ্ধান্ত জিন্নাহ সমর্থন করতে পারেননি। তিনি মুসলিম লীগের কর্মসচিব লিয়াকত আলী খানকে নির্দেশ দেন যে, অবিলম্বে প্রতিরক্ষা পরিষদে মনোনীত মুসলমান সদস্যদের নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ পাঠানো হোক। এ বিষয়ে বিবেচনার জন্য তিনি ১৯৪১ সালের ২৪ আগষ্ট বোম্বাই শহরে লীগ কমিটির সভা আহবান করেন।[১০৭] পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকান্দার হায়াত খান এবং আসামের প্রধানমন্ত্রী স্যার সাদুল্লাহ জিন্নাহর পরামর্শে প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করতে সম্মত হন। ফজলুল হক এ সভায় উপস্থিত হতে পারেননি। লীগ কমিটি ফজলুল হক ও বেগম শাহনেওয়াজকে পরিষদ থেকে পদত্যাগ করতে দশ দিনের সময় দেয় এবং অন্যথায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য লীগ সভাপতিকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে।[১০৮]

ফজলুল হক বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রবীন রাজনীতিবিদ এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রি ছিলেন। তিনি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা ও ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন। কিন্তু লীগ কর্মকর্তাদের এমন ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে ৮ই সেপ্টেম্বর ফজলুল হক এক পত্রে জানান যে, তিনি প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করবেন এবং লীগ কমিটি ও লীগ পরিষদ থেকেও পদত্যাগ করবেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, লীগ সভাপতি অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ও স্বেচ্ছাচারী রূপে কাজ করছেন এবং বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক শাসন কার্যের ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ করছেন।[১০৯] মুসলিম লীগ কমিটি এ অভিযোগ আপত্তিজনক বলে মনে করেন এবং তাঁকে দশদিনের মধ্যে

অভিযোগ উঠিয়ে নিতে নির্দেশ দেন।[১১০] ফজলুল হক জানান যে, তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি এবং কারো মনে আঘাত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলনা। তাঁর এ কৈফিয়ৎ অধিকাংশ সদস্যের মত অনুযায়ী গৃহীত হয়।[১১১]

ফজলুল হকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবেগ প্রবণতার আধিক্য ছিল এবং কারো কর্তৃত্ব তিনি পছন্দ করতেন না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় লীগের হস্তক্ষেপ তিনি মেনে নিতে পারেননি।[১১২] জিন্নাহর সাথে মতান্তরের পরে লীগের অনেক কর্মকর্তার সাথে তাঁর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে। তিনি তাদের উপেক্ষা করে চলেন এবং মনে করেন যে, স্বীয় জনপ্রিয়তার বলে তিনি বাংলার রাজনৈতিক জীবন স্বাধীনভাবে চালাতে পারবেন। কিন্তু অচিরেই তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। এসময় বাংলার শিক্ষিত ও ছাত্র সমাজ মুসলিম লীগের আদর্শে ও নেতৃত্বে অকুণ্ঠ আস্থা স্থাপন করেছে এবং লীগের সংহতি রক্ষার জন্য তারা সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল। এ সুযোগে ফজলুল হকের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিরাও তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতে থাকে।[১১৩]

অবশেষে ১৯৪১ সালের নভেম্বরে প্রজা-লীগ কোয়ালিশন সরকার থেকে মুসলিম লীগ পৃথক হয়ে যায় এবং ৭ ডিসেম্বর ফজলুল হক ও তাঁর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। এরপর ফজলুল হক আইন সভার হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সভ্যদের নিয়ে 'প্রগ্রেসিভ পার্টি' নামে একটি যুক্ত দল গঠন করেন এবং এ দলের নেতা নির্বাচিত হন। প্রজা-লীগ মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যাওয়ার পরেও আইন সভায় ফজলুল হকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় গর্ভনর তাঁকে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করতে আহবান করেন।[১১৪] ফজলুল হক তাঁর কৃষক প্রজা পার্টির মাধ্যমে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব গতি সঞ্চার করেছিলেন যার প্রতিফলন ঘটেছিল নিষ্ক্রিয় মুসলিম লীগের পুনর্জাগরণের মধ্যে দিয়ে। মূলত, তাঁর ক্ষমতা এবং জনপ্রিয়তাই বাংলার জনসাধারণের কাছে মুসলিম লীগকে তখন এক অদ্বিতীয় রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করেছিল। তাঁর নেতৃত্বে প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা পূর্ববাংলার মুসলমানদের ভাগ্য উন্নয়নে

যে সাফল্য অর্জন করেছিল তা ছিল অতুলনীয়। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় লীগের পরিবর্তশীল নীতির কারণে এ সময় থেকে বাংলার রাজনীতিতে ব্যাপক ছন্দপতন শুরু হয়।

তথ্যনির্দেশ

১। Harun-or-Rashid, The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics (1906-1947), The University Press Limited, Dhaka, 1987, P: 31.

২। এম.এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), চতুর্থ প্রকাশ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ: ১৯৩।

৩। Abdul Karim, a senior Vice-President of Nikhil Bangla Praja Samity, was the President of the BPML and R.Ahmed, distinguished dentist and a leading Praja leader, was Secretary (from 1933), Akram khan, the Secretary of the Praja Samity and Fazlul Haq, Mujibur Rahman and Abdul Momin who were its Vice-President were also amongst the Vice-President of the BPML. See Star of India, 22 June 1396, P: 5.

৪। Abul Mansur Ahmad, Sher-e-Bangla and Presents, Pakistan Observer, April 27, 1968, P: 1-11.

৫। আমীর আলী, মেময়রস, ইসলামিক কালচার, ৫ম খন্ড, ১৯৩১, পৃ: ১৭০।

৬। ড: আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১), বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ: ১২৯।

৭। P.E. Roberts, History of British India : Under the Company and the Crown, London, Reprinted, 1958, P: 169.

৮। Humaira Momen, Muslim Politics in Bengal, Dacca, 1972, P: 141.

৯। আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৫৩।

১০। এ. খালেক, এক শতাব্দী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ১০৩।

১১। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৫।

১২। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭২।

১৩। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩০।

১৪। আবদুর রহিম মেদেনীপুরের এক জমিদার পরিবারে ১৮৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিলাত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে ১৮৯০ সালে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০০ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি ১৯০৬ সালে সিমলায় বড়লাটের কাছে প্রেরিত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি বাংলার গর্ভনরের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। সূত্রঃ এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৫।

১৫। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১।

১৬। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৬।

১৭। সোহরাওয়ার্দী পরিবার মেদেনীপুরের অধিবাসী। স্যার জাহিদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তাঁর পুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্ম ১৮৯২ সালে। তিনি বিলাত থেকে এম.এ. ও বি.সি.এল. পাশ করেন এবং কলকাতায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২১ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। সূত্রঃ এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৫।

১৮। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮১।

১৯। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩১।

২০। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৬।

২১। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৮।

২২। বি.ডি. হাবিবুল্লাহ, ফজলুল হক, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ: ২৯।

২৩। M.A.H. Ispahani, Quaid-i-Azam Jinnah as I know him, Karachi, 1976, P: 14.

২৪। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৭।

২৫। আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৩।

২৬। Mohammad Siraj Mannan, The Muslim Political Parties in Bengal (1936-1947) : A study of Their Activities and struggle for Freedom, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1987, P: 19.

২৭। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৭।

২৮। Mohammad Seraj Mannan, op. cit., P: 21.

২৯। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 43.

৩০। M.A.H. Ispahani, op. cit., P: 15.

৩১। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 44.

৩২। I.H. Qurashi, Muslim Stragle for Pakistan, History of the Freedom Movement 3rd part, 1962, P: 35.

৩৩। M.A.H. Ispahani, op. cit., P: 20.

৩৪। M.A.H. Ispahani to M.A. Jinnah (telegram), in Z.H. Zaidi, ed, M.A. Jinnah-Ispahani Correspondence, 1936-1948, Karachi, 1975, P: 26.

৩৫। M.A. Jinnah to M.A.H. Ispahani, Ibid., P: 27.

৩৬। M.A.H. Ispahani, op. cit., P: 23.

৩৭। During mid 1936 political rivalry grew up between the Krishak Proja Party and the United Muslim Party. In this situation the United Muslim Party called a three-day All-Bengal Conference at the Calcutta Town Hall in August 1936. A large number of delegates were to attend the conference. So, M.A.H. Ispahani, fearing ensuing success of the party, persuaded A.K. Fazlul Haq to create disturbance, in the conference to bar the success of the United Muslim Party. On the first day of the conference in pre-planned way, A.K. Fazlul Haq entered the Town Hall with some of his supporters. At one stage of the proceedings of the conference A.K. Fazlul Haq stood up and started addressing the gathering but the workers of the United Muslim party shouted loudly to stop him. The counter shouting from the supporters of A.K. Fazlul Haq created a confusing situation and working

of the meeting became impossible. Thereupon, M.A.H. Ispahani suggested postponement of the conference and also to invite Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah to settle the difference among various leaders of Bengal. See M.A.H. Ispahani, op. cit., P: 20-23. Also see Rangalal Sen, "Elite Conflict and Muslim Politics in Bengal, 1937-1947", in S.R. Chakravarty and Virendra Narain, Bangladesh History and culture, New Delhi, 1986, P: 85.

৩৮। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৮।

৩৯। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৫।

৪০। Humayun Kabir, Muslim Politics: 1906-1942, Calcutta, 1943, P: 10.

৪১। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৯।

৪২। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১২।

৪৩। এনায়েতুর রহিম, বাংলার স্ব-শাসন (১৯৩৭-১৯৪৩), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ: ৪৯।

৪৪। আবুল মনসুর আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৩।

৪৫। সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, বঙ্গীয় আইন সভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ: ২৩৭।

৪৬। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৯।

৪৭। Chowdhury Khaliquzzaman, Pathway to Pakistan, Lahore, 1961, P: 165.

৪৮। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 82.

৪৯। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২০০।

৫০। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৭।

৫১। Indian Annual Register Calcutta: The Annual Register Office, 1937, Vol-I, P-31.

৫২। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৭।

৫৩। Shila Sen, Muslim Politics in Bengal, (1937-1947), New Delhi, Impex India, 1976, P: 91.

৫৪। M.A.H. Ispahani, op. cit., P: 28.

৫৫। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 84.

৫৬। The portfolios were distributed as follows:

Fazlul Haq-Chief Minister (Education), Sir Nazimuddin (Home), Khwaja Habibullah (Agriculture and Industries), Suhrawardy (Commerce and Labour), Nausher Ali (Public Health and Local Self-Government), Musharraf Hossain (Judiciary and Legislature), Nalini Ranjan Sarker (Finance), Sir B.P. Singh Roy (Revenue), Prasanna Dev Raikut (Excise and Forest), Mukunda Bihari Mullick (Co-Operative, Credit

and Rural Indebtedness) and Maharaja Sris Chandra Nandy (Communications and works). See a breif summary of Political Events 1937; also Star of India, 1 April 1937, P: 5.

৫৭। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪১।

৫৮। The Amrita Bazar Patrika, 25 June 1938, P: 5.

৫৯। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪২।

৬০। Helen M. Nugent, Politics of Partition: Bengal 1932-1947, Ph.D. Thesis, University of Queensland, 1978, P: 175.

৬১। মুসলিম লীগের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে (১৫ই অক্টোবর ১৯৩৭) ফজলুল হক "শের-ই-বাংলা" ধ্বনি দ্বারা সম্বর্ধিত হন। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। Star of India, 22 November, 1937, P: 5.

৬২। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২০১-২০২।

৬৩। H.S. Suhrawardy wrote, "I would like to adapt the rules and regulations to provincial conditions and as we want to get into touch with the masses, Provision.....should be made in the rules for levy of only a small subscription.....For this purpose probably it would be better to give every province the liberty to frame its own rules..... In another letter to Jinnah, he wrote, I would ofcourse like to point out to you that the present constitution of the league is undemocratic and future body should not have a subscription of more than four

annas a year. See Suhrawardy to Jinnah, 23 June 1937, Quaid-I-Azam Papers, F-458, P: 7.

৬৪। Nawab Farooqui, a former ministerial aspirant and the disgruntled member of the KPP belonging to shamsuddin group. See Harun-or-Rashid, op. cit., P: 92.

৬৫। Proceedings of the annual general meeting of the Bengal Muslim League held on 22 August, 1935, BPML, Vol:38, 1932-38, P: 46-56.

৬৬। Azad, 2 January 1938, P: 5.

৬৭। Suhrawardy to Shamsul Hasan, Joint Secretary AIML, 21 November 1938, BPML, Vol: 38, P: 103.

৬৮। Fazlul Haq to Liaquat Ali Khan, 22 April 1939, BPML, Vol: 39, 1939-41, P: 11.

৬৯। Star of India, 19 April 1939, P: 7.

৭০। Suhrawardy's speech at the General Committee meeting of the BPML held on 23 October, Star of India, 31 October 1939, P: 7.

৭১। Shila Sen, op. cit., P: 124.

৭২। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 106.

৭৩। Shila Sen, op. cit., P: 103.

৭৪। Muhammad Waliullah, Yug Bichitra, Dhaka, 1967, P: 378.

৭৫। আবুল মনসুর আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২।

৭৬। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৩।

৭৭। Shila Sen, op. cit., P: 105.

৭৮। আবুল মনসুর আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩।

৭৯। Ram Gopal, Indian Muslims: A political History (1858-1947), Bombay, Reprinted, 1964, P: 129.

৮০। I.H. Qurashi, op. cit., P: 81.

৮১। Ibid., P: 89.

৮২। Chaudhury Khaliquzzaman, op. cit., P: 171.

৮৩। Ibid.

৮৪। অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭২, পৃঃ ৩২।

৮৫। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৩।

৮৬। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫।

৮৭। Kamruddin Ahmed, A Social History Of Bengal, Dhaka, 1970, P: 49.

৮৮। দ্বি-জাতি তত্ত্বে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ উল্লেখ করেন, “We maintain and hold that Muslism and Hindus are two major nations by any definntion or text of a nation. We are a nation of a hundred million and what is more, we are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, …. customs ….. history and traditions, attitude and ambitions. In short, We have our distinctive outlook on life and of life”. See, Tara Chand, History of Freedom Movement in India, Vol. III, New Delhi, 1920, P: 149.

৮৯। Muslim League Resolutions, 1940.

৯০। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২১।

৯১। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২২।

৯২। Abul Mansur Ahmed, End of a Betrayal and Restoration of Lahore Resolution, Dacca, Khoshroz Kitab Mahol, 1975, P:49.

৯৩। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৪।

৯৪। ড. এ.এইচ.এম. মাহবুবুর রহমান, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃঃ ৯৭।

৯৫। For instance, Abul Quasem, the secretary of the KPP(Haq), was the President of the Khulna District Muslim League, Star of India, 20 December, 1937, P:6; Khan Bahadur Hashim Ali

khan, one of the senior Vice Presidents, was the President of the Barishal District Muslim League, Azad, 2 February 1938, Star of India, 16 June 1939, P:6, Khan Shahib Syed Afzal, Haq's nephew and a leading member of his party, was the President of the Pirojpur Sub-divisional League, Star of India, 12 July 1939, P: 6, Abdul Hakim Vikrampuri, one of the Assistant Secretaries of the KPP (Haq), was the Secretary of the Munshiganj Sub-divisional League; Tara Chand, op. cit., P: 7

৯৬। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 105.

৯৭। Suhrawardy's speech at Mollar Hut (Khulna) on 15 January, 1938, Azad, 20 January, 1938, P: 8.

৯৮। See Fazlul Haq's statement to the associated press immediately after his joining the Muslim League in Star of India, 18 October, 1937, P: 4.

৯৯। Humayun Kabir, Muslim Politics: 1906-1942, Calcutta, 1943, P: 43.

১০০। Ispahani to Jinnah, 26 March 1941, P: 168.

১০১। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৬।

১০২। Muslim League Resolutions, 1940.

১০৩। Ibid.

১০৪। Jamiluddin, Speech of Jinnah, P: 175.

১০৫। Muslim League Resolutions, 1940.

১০৬। Star of India, 28 September, 1940, P: 6.

১০৭। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৭।

১০৮। Indian Annual Register, 1940, P: 345.

১০৯। Star of India, 10 September 1941, P: 3.

১১০। Chaudhury Khaliquzzaman, op. cit., P: 254.

১১১। Kamruddin Ahmad, op. cit., P: 55.

১১২। Chaudhury Khaliquzzaman, op. cit., P: 255.

১১৩। Ibid., P: 256.

১১৪। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৮।

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্গীয় মন্ত্রিসভার কার্যক্রম ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য মুসলিম লীগের সংগ্রাম (১৯৪০-১৯৪৭)

বাংলার ইতিহাসে ১৯৪১-১৯৪৭ সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল রাজনীতির আবর্তনের সময়। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যে সকল আইন প্রণেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত স্বপদে বহাল ছিলেন এবং বহুলাংশে প্রদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ১৯৪৭ সালের মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে একে একে চারটি মন্ত্রিসভার রদবদল হলেও বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের (BPML) অবস্থান সুদৃঢ় হয়। হারুন-অর রশীদের মতে, "During this period, the BPML turned its attention towards party organization as well as the policy matters. Attempts were made to define its position in relation to non-Muslims of Bengal in one hand and the All India Muslim League (AIML) of the Muslims of the Western Zone on the other hand, involving the issue of Pakistan."[১]

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রভূত সাফল্য অর্জন করে। এসময় বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের উত্থান, বিকাশ ও পাকিস্তান আন্দোলনের বিস্তার ঘটে।[২] হিন্দু-মুসলিম অর্ন্তদ্বন্দ্বের কারণে ভারতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। পরিণামে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কাছে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়।[৩] ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং প্রায় দু'শো বছরব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। [৪]

৫.১ বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা গঠন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের কার্যক্রম

১৯৩৭-১৯৪৭ সালের মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে মোট চারটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিলঃ

(১) এ. কে. ফজলুল হকের প্রজা-লীগ যুক্ত মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

(২) এ. কে. ফজলুল হকের প্রগ্রেসিভ যুক্ত বা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩)

(৩) খাজা নাযিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-১৯৪৫) এবং

(৪) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা (১৯৪৬-১৯৪৭)।[৫]

এ. কে. ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা অর্থাৎ 'প্রজা-লীগ যুক্ত মন্ত্রিসভা' সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪১ সালের নভেম্বরে মুসলিম লীগ প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়। ৩ ডিসেম্বর ফজলুল হক তাঁর ব্যক্তিগত সহযোগী, হিন্দু মহাসভা ও ফরওয়ার্ড ব্লক, কৃষক প্রজা (শামসুদ্দিন) এবং তফসিলী হিন্দু এ দলগুলো নিয়ে নবগঠিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন।[৬] একই দিনে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁকে সংগঠন ও মুসলিম স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন।[৭] আইনসভায় ফজলুল হকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এজন্য গভর্নর তাঁকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করার আহ্বান করেন। ১৯৪১ সালের ১১ ডিসেম্বর ফজলুল হক প্রগ্রেসিভ যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা শরৎবসু গ্রেফতার হওয়ার কারণে মন্ত্রিসভার একাংশ নেতা ১৪ ডিসেম্বর শপথ গ্রহণ করেন।[৮]

নতুন মন্ত্রিসভায় ফজলুল হক ছাড়াও চারজন হিন্দু ও চারজন মুসলিম সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন খাজা হাবীবুল্লাহ (মুসলিম লীগ ত্যাগকারী), খানবাহাদুর আবদুল করিম (স্বতন্ত্র), খানবাহাদুর হাশেম আলী খান (কৃষক প্রজা পার্টি), শামসুদ্দিন আহমদ (কৃষক প্রজা পার্টির এক অংশের নেতা), শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী (হিন্দু মহাসভা), সন্তোষ কুমার বসু (ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস), প্রমথনাথ ব্যানার্জী (ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস) এবং উপেন্দ্রনাথ বর্মন (তফসিলী হিন্দু)।[৯] হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে[১০] গুরুত্বপূর্ণ অর্থ

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে এ মন্ত্রিসভাকে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা নামে অভিহিত করা হয়।[১১] মন্ত্রিসভার এরূপ গঠন দেখে গর্ভনর জেনারেল লিনলিথগো মন্তব্য করেন, "এটি খুব লক্ষনীয় বিষয় হবে যদি এ মন্ত্রিসভা নয় বা দশমাস একত্রে থাকতে পারে।"[১২] অন্যদিকে মুসলিম লীগ সভাপতি উপহাস করে বলেন, "ভাইসরয়কে বড় দিনের উপহার দিলাম ফজলুল হককে এবং বাংলার গভর্নরকে নববর্ষের উপহার দিলাম ঢাকার নবাবকে"।[১৩]

সারণি-৩ঃ ফজলুল হকের প্রগ্রেসিভ যুক্ত বা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩)[১৪]

নাম	মন্ত্রণালয়
এ. কে.ফজলুল হক	মুখ্যমন্ত্রি, স্বরাষ্ট্র ও প্রচার মন্ত্রণালয়
ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী	অর্থ মন্ত্রণালয়
খাজা হাবীবুল্লাহ বাহাদুর	কৃষি, শিল্প মন্ত্রণালয়
সন্তোষ কুমার বসু	জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রণালয়
খান বাহাদুর আবদুল করিম	শিক্ষা ও বানিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রমথনাথ ব্যানার্জী	রাজস্ব, বিচার, আইন মন্ত্রণালয়
খান বাহাদুর মৌলভী হাশেম আলী খান	সমবায়, ঋন ও গ্রামীন ঋন মন্ত্রণালয়
শামসুদ্দিন আহমদ	যোগাযোগ ও পূর্ত মন্ত্রণালয়
উপেন্দ্রনাথ বর্মন	বন ও আবগারি মন্ত্রণালয়

নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সময় আইন সভায় মুসলিম লীগের ৪০জন সভ্য ছিলেন। তাঁরা খাজা নাযিমুদ্দীনের নেতৃত্বে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।[১৫] প্রগ্রেসিভ যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করায় জিন্নাহ ফজলুল হক ছাড়াও মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য নবাব হাবিবুল্লাহকে মুসলিম লীগ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের ১৫ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনে জিন্নাহ তাঁর সভাপতির অভিভাষণে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ও মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ করেন এবং যে সকল ঘটনার কারণে তাঁকে লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তা বর্ণনা করেন।[১৬]

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা ৪৭৫ দিন ক্ষমতায় ছিল। এসময় তাঁকে প্রতিটি দিন কাটাতে হয়েছে মুসলিম লীগের বিরোধিতার মুখে। তারপরেও তিনি মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি সজাগ ছিলেন। এ সময় এ. আর. পি. ও অন্যান্য সরকারী বিভাগে বহু মুসলমানকে নিয়োগ করা হয়। মুসলমান প্রার্থীদেরকে যাতে নির্ধারিত হার অনুযায়ী নিয়োগ করা হয় সেজন্য ফজলুল হক কড়া নির্দেশ জারি করেন। এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে (Communal Ratio Officer) তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার আদেশ দেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের সহযোগীতায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুইশত মুসলমানের চাকরীর ব্যবস্থা করেন।[১৭]

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ফজলুল হক তাঁর মন্ত্রিসভায় অধিকসংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের স্থান দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁর নতুন আন্তঃসাম্প্রদায়িক মন্ত্রিসভা ভারতীয় ইতিহাসের এক সংকটকালে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কাছে হিন্দু মুসলিম সহযোগীতায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।[১৮] সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হয়েছিল। তাঁর মন্ত্রিসভা যে ষোল মাস ক্ষমতায় ছিল সে সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনেকটা কমে গিয়েছিল। ১৯৪২ সালের জুন মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু মুসলিম ঐক্য সম্মেলনে ফজলুল হক বলেন, "Hindus and Muslims must realize that they had got to live together, sink or swim together and if need be lay down their lives together for the good of their common motherland".[১৯]

হিন্দু মহাসভার সাথে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করায় এবং মুসলিম লীগে না থাকার কারণে কিছুদিনের মধ্যেই মুসলিম ছাত্র সমাজে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা এক মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। যে ছাত্ররা পূর্বে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা দিত তারাই তাঁকে কালো পতাকা

প্রদর্শন করে। ঢাকা-বরিশাল যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে।[২০] মূলত, এক্ষেত্রে এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী ছাত্রদেরকে সংঘবদ্ধ করে ফজলুল হক এবং তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এক বিরুদ্ধশক্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হন এবং তাঁদের উপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। এর ফলে কয়েকজন সভ্য ফজলুল হকের দল ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দিতে বাধ্য হন। ১৯৪২ সালের এপ্রিলে নাটোর ও বাগেরহাট উপনির্বাচনে তাঁর দলীয় প্রার্থীগণ লীগের প্রার্থীদের কাছে হেরে যান।[২১]

বাংলার শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা শেরেবাংলা সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই প্রথমবার জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অবস্থায় পড়েন। পক্ষান্তরে, মুসলিম লীগ পুরোদমে দলের ভিত্তি সুদৃঢ় করে গড়ে তুলতে সক্রিয় থাকে। কেননা বাংলা প্রদেশে লীগ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এবং সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়ে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। মন্ত্রিসভা গঠনের সাত মাসের মধ্যে ৫০০-৮০০ বক্তৃতায় লীগ নেতারা ফজলুল হককে মুসলমানদের শত্রু ও মীরজাফর হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন।[২২]

এসময় সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগের বিরামহীন প্রচেষ্টায় লীগের পাকিস্তান দাবি জনপ্রিয়তা লাভ করে। এভাবে তৎকালীন পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলার মুসলিম সমাজ পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভার বিভিন্ন কার্যক্রম দ্বারা উপকৃত হয়ে নিজেদেরকে মুসলিম লীগের সাথে জড়িয়ে ফেলেন। হক বিরোধী আন্দোলনে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বাংলার গভর্নর জন হাবার্ট এবং মূখ্যসচিব থেকে মহকুমা অফিসার পর্যন্ত সর্বস্তরের আমলাদের আনুকূল্য লাভ করেন।[২৩] তাই মুসলিম লীগের বিরোধিতা ছাড়াও ফজলুল হককে অন্য এক প্রতিপক্ষ গভর্নর জন হাবার্টের মুখোমুখি হতে হয়। তিনি ফজলুল হকের রাজনৈতিক অবাধ নীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করেন। ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট যখন কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' (Quit India) আন্দোলন শুরু করেন তখন এ বিক্ষোভের প্রতিক সরকারী নীতি নিয়ে গভর্নর ও ফজলুল হকের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য শুরু হয়।[২৪] ১৯৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী গভর্নরের কাছে এক পত্রে ফজলুল হক তাঁর

অনিয়মতান্ত্রিক কাজের প্রতিবাদ করেন এবং শাসন ব্যপারে ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগের সমালোচনা করেন।[২৫]

গভর্নর জন হাবার্ট ফজলুল হককে ক্ষমতাচ্যুত করার অজুহাত খুঁজছিলেন। যেহেতু আইন সভায় ফজলুল হকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তাই গভর্নর প্রকাশ্যে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে কূটকৌশলের আশ্রয় নেন।[২৬] ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ ফজলুল হককে অসাংবিধানিকভাবে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়, যা ছিল বরখাস্তের নামান্তর মাত্র। এরপর গভর্নর প্রদেশে ৯৩ ধারা আরোপ করে নিজে প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন ।[২৭]

এ. কে. ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার পদত্যাগের সময় গভর্নর একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের ধারণা দিলেও ভারতীয় রাজনীতির বিশেষ প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা খাজা নাযিমুদ্দীনকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানানো হয়। ১৯৪৩ সালের ২৩ এপ্রিল নাযিমুদ্দীন ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন।[২৮] মুসলিম লীগের তরুন নেতা ও ছাত্র সমাজের ইচ্ছে ছিল দলের মূল সংগঠক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রি হবেন। কারণ ফজলুল হকের পর তিনিই ছিলেন বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যোগ্যতম নেতা। কিন্তু আইনসভায় এবং তৎকালীন রাজনীতির ধারা অনুযায়ী জমিদার হিসেবে খাজা নাযিমুদ্দীনের প্রভাব ছিল। তাছাড়া মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলী খানের বিশ্বস্ত নেতা ছিলেন বলে নাযিমুদ্দীনই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।[২৯]

সারণি-৪ঃ নাযিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-১৯৪৫)[৩০]

নাম	মন্ত্রণালয়
খাজা নাযিমুদ্দীন	স্বরাষ্ট ও দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়
জামিউদ্দীন খান	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ উদ্দিন হোসেন	কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
নবাব মোশাররফ হোসেন	বিচার ও ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
খাজা শাহাবুদ্দীন	বানিজ্য, শ্রম ও শিল্প মন্ত্রণালয়
খান বাহাদুর জালালউদ্দীন আহমদ	জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রণালয়
তুলসীচরণ গোস্বামী	অর্থ মন্ত্রণালয়
বরদা প্রসন্ন পাইন	পূর্ত ও যানবাহন মন্ত্রণালয়
তারকনাথ মুখার্জী	রাজস্ব ও রিলিফ মন্ত্রণালয়
হেমহরি বর্মা	বন ও আবগারি মন্ত্রণালয়
পুলিন বিহারী মল্লিক	প্রচার মন্ত্রণালয়
যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল	সমবায়, ঋন ও পল্লীদরিদ্র মন্ত্রণালয়

ফজলুল হকের পদত্যাগের প্রাক্কালে মুসলমান সদস্যরা মুসলিম লীগে যোগ দিতে থাকেন। ফলে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সদস্য সংখ্যা ৪০ থেকে ৭৯ জনে উন্নীত হয়। নাযিমুদ্দীনের সমর্থনে ইউরোপীয় গ্রুপ, তফসিলী হিন্দুদের একাংশ, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও অন্য আরো কিছু সদস্যের সমর্থন ছিল।[৩১] কিন্তু নাযিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার দুর্ভাগ্য যে, প্রদেশের প্রশাসনিক বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার আগেই বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। বাংলা ১৩৫০ সালে (১৯৪৩ ইং) এ দুর্ভিক্ষ হয় বলে তা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।[৩২]

খাদ্যশস্যের ঘাটতি প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে, লীগ সরকার গঠনের পর পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়। তৎকালীন বাংলা সরকার কর্তৃক 'উডহেড কমিশন' যে রিপোর্ট প্রদান করে তাতে বলা হয় যে, এ দুর্ভিক্ষের জন্য ভারত সরকার, হক মন্ত্রিসভা ও মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা সকলেই আংশিক ভাবে দায়ী।[৩৩]

মূলত, নাযিমুদ্দীনের মন্ত্রিত্বের সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার এক পর্যায়ে জাপান কর্তৃক ভারত আক্রমনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে ব্রিটিশ সরকার বাংলা প্রদেশের যানবাহন নষ্ট করে দেয় এবং খাদ্যশস্য কিনে গুদামজাত করে ও সৈন্যদের প্রয়োজনে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তাছাড়া, সরকারি আমলাদের কর্তব্যে ত্রুটি ও দায়িত্বহীনতা এবং মুদ্রাস্ফীতির জন্য পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। এ সংকটজনক মুহূর্তে খাদ্যমন্ত্রি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরিস্থিতি সামাল দিতে চেষ্টা করেন।[৩৪] তবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার এদিকে দৃষ্টিপাত করেনি। বাংলার মানুষের জীবন রক্ষার চেয়ে সাম্রাজ্য রক্ষা করা তখন তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যেও খাদ্যমন্ত্রি এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী নিজ তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জেলায় খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। সরকারী প্রচেষ্টায় অনেকগুলো লঙ্গরখানা খোলা হয় এবং নিরন্ন ও দুস্থ মানুষের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।[৩৫]

মুসলিম লীগ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনেক জীবন রক্ষা করা সম্ভব হলেও সরকারী হিসেবে এসময় ১৫ লক্ষ এবং সমসাময়িক অন্যান্য উৎসে ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যুর তথ্য পাওয়া যায়।[৩৬] নাযিমুদ্দীন ব্যক্তিগতভাবে সৎ হলেও তাঁর মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য ছিলেন দুর্নীতিগ্রস্থ। সাম্প্রদায়িকতা ও স্বজনপ্রীতির কারণে এ মন্ত্রিসভার জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। আইনসভায়ও নাযিমুদ্দীনের লীগ মন্ত্রিসভা দুর্বল হয়ে পড়ে কেননা তাঁকে হিন্দু ও ইউরোপিয়ান সভ্যদের উপর নির্ভর করতে হত।[৩৭] ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস থেকে হিন্দু সম্প্রদায় নাযিমুদ্দীনকে সমর্থন দিলেও সরকারের বৈষম্য নীতি ও পাকিস্তান আন্দোলনের বিস্তৃতির কারণে হিন্দুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নাযিমুদ্দীন বিভিন্ন বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িক

সম্প্রীতির বদলে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৪ সালের ৯ এপ্রিল গয়ায় পাকিস্তান সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, "It is the duty of the muslim ministers in the majority provinces to so govern and administer that non muslim minorities will have no reason to oppose Pakistan."[৩৮]

মুসলিম লীগের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বও মন্ত্রিসভার পতনের জন্য দায়ী ছিল। ১৯৪৪ সাল থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নাযিমুদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকে। ফলে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ নাযিমুদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দী এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় লীগের সভাপতি মুহম্মদ আলী জিন্নাহ নাযিমুদ্দীনের পক্ষ নিলে সোহরাওয়ার্দী অসন্তুষ্ট হন। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ বাজেট বরাদ্দের উপর ভোটাভুটি হলে সরকার সমর্থকরা বিরোধী শিবিরে যোগ দেয় এবং ১০৬-৯৭ ভোটে নাযিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।[৩৯] গভর্নর আর. জি. কেসী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ না করে প্রদেশে গভর্নরের শাসন প্রচলন করেন।[৪০]

৫.২ ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের অবস্থান

নাযিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার পতনের এক বছরের মধ্যে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৫ সালের ১০ ও ১২ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদ ও ১৯৪৬ সালের ১৯-২২ মার্চ বাংলাসহ সারা ভারতের সকল প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ব্রিটিশ শাসনাধীনে সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন বলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম ৪১ বঙ্গীয় মুসলিম লীগের (BPML) সাধারণ কর্মসচিব নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তাঁর ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এসময় মুসলিম লীগ বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।[৪২] নির্বাচনের আগে বঙ্গীয় মুসলিম

লীগের সভ্যসংখ্যা দশ লক্ষে পৌঁছে এবং শিক্ষিত যুবকরা জেলা লীগ পরিষদ ও প্রাদেশিক লীগ পরিষদে আসন লাভ করে। এসময় বিশ লক্ষ লোক সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের (AIML) সভ্যভুক্ত হয়। এর ফলে লীগ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শক্তিশালী আন্দোলনে অবতীর্ণ হতে পারে এবং নির্বাচনে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে।[৪৩]

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে এবং কংগ্রেস অখন্ড ভারতের আদর্শে প্রতিযোগীতা করার প্রস্তুতি নেয়। বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে মোট ১৫ টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। এদের মধ্যে মোমিন, আহরার, জামিয়াতুল, উলামায়ে হিন্দ, মুসলিম মজলিশ, লালকোর্তা প্রভৃতি দলগুলোও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করতো কিন্তু তারা অখন্ড ভারতে বিশ্বাসী ছিল।[৪৪] নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ সকল মুসলমানকে মুসলিম লীগে যোগদান করতে আহবান করেন। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনী প্রতিযোগীতায় আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে; (১) পাকিস্তান দাবি এবং (২) মুসলিম লীগ যে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তা প্রতিপন্ন করা।[৪৫]

১৯৪৫ সালে জুলাই মাসে মুহম্মদ আলী জিন্নাহকে সভাপতি করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সংস্থা এবং ৯ সদস্য বিশিষ্ট প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থা গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থার কাজ ছিল পরামর্শের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করা।[৪৬] মাওলানা আকরাম খান লীগের সভাপতি ও খাজা নাযিমুদ্দীন আইনসভায় লীগ দলের নেতা ছিলেন। তাঁরা পদাধিকার বলে নির্বাচনী সংস্থার সদস্য হন। এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী আইনসভায় লীগ দলের উপনেতা (Deputy Leader) ছিলেন। তাঁর সদস্যভুক্তির ব্যাপারে নাযিমুদ্দীনের সমর্থন না থাকায় প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থায় সোহরাওয়ার্দী মনোনীত হননি। ফলে আইনসভায় লীগ নাযিমুদ্দীন দল ও সোহরাওয়ার্দী দল - এ দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৪৭] সোহরাওয়ার্দী প্রাদেশিক লীগের সাধারণ কর্মসচিব আবুল হাশিমের সহযোগীতা লাভ করেন। এর ফলে প্রাদেশিক লীগ

পরিষদের বৈঠকে যে নির্বাচন হয় তাতে সোহরাওয়ার্দীর পক্ষের ৫ জন প্রার্থীর সকলেই নির্বাচিত হয় এবং প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থায় তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এম.এ.এইচ. ইস্পাহানী এক চিঠিতে জিন্নাহকে এ নির্বাচনের ফলাফল জানান এবং মন্তব্য করেন যে, সোহরাওয়ার্দী দলের অন্তত দুইজন সদস্য বিপজ্জনক এবং নাযিমুদ্দীন দলের দুইজন অকর্মন্য।[৪৮]

প্রাদেশিক নির্বাচনী সংস্থায় সোহরাওয়ার্দী দলের ৫ জন ও নাযিমুদ্দীন দলের ৪ জন সদস্য ছিল। সংখ্যাধিক্যের বলে সোহরাওয়ার্দী এর কর্মসচিব নিযুক্ত হন। নাযিমুদ্দীনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী নাযিমুদ্দীনের দলের ৩৫ জনকে আইনসভার নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনীত করেন। এরপর কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সংস্থার সাহায্যে নাযিমুদ্দীন তাঁর দলের আরও ১৮ জনের জন্য মনোনয়ন লাভ করেন। এভাবে বঙ্গীয় আইন সভায় ১১৯টি মুসলমান আসনের মধ্যে তিনি ৫২টি আসনের জন্য তাঁর দলের প্রার্থী মনোনীত করতে সমর্থ হন।[৪৯]

১৯৪৫ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০টি মুসলমান আসনের সবগুলো মুসলিম লীগ দখল করে। ৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৫৭, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৫টি,আকালী শিখরা ২টি এবং ইউরোপীয়ানরা ৮টি আসন দখল করে।[৫০] জিন্নাহ বোম্বাই থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় নির্বাচনে বিরাট সাফল্য উপলক্ষ্যে মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে 'বিজয় দিবস' উদযাপন করে। বাংলার সর্বত্র মহাসমারোহে মুসলিম লীগের বিজয় দিবস পালিত হয়।[৫১]

প্রাদেশিক নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে জিন্নাহ এম. এ. এইচ. ইস্পাহানীর আমন্ত্রণে কলকাতা আসেন এবং ইস্পাহানীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। ১লা মার্চ তিনি লীগ কর্মীদের সাথে আলোচনায় বসেন এবং কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পুঁজিপতিদের প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি নেই।

কলকাতা থেকে রেল সেলুনে আসাম যাওয়ার পথে প্রত্যেক স্টেশনে জনতার সমাবেশে তিনি উৎসাহ দেন এবং নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করতে উপদেশ দেন। এসময় ইস্পাহানী ও সোহরাওয়ার্দী তাঁর সাথে অবস্থান করেন।[৫২]

নির্বাচনের আগে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আকরাম খান অসুস্থতার কারণে মধুপুরে যান এবং নাযিমুদ্দীন রাজনৈতিক কাজে লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। সোহরাওয়ার্দী নির্বাচনী প্রচারকাজের জন্য সবরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এ কাজে মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড কর্মী ও ছাত্রদের নিয়োগ করা হয়। মাওলানা রুহুল আমীন, ফুরফুরার পীর সাহেব এবং আরো অনেক আলেম মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারকাজ করেন। এছাড়া পত্র পত্রিকার বড় অংশ ছিল মুসলিম লীগের সমর্থক।[৫৪] প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীদেরকে প্রধানত ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। লীগ থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পরও ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাবের আদর্শ নিয়ে কৃষক প্রজা পার্টির পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন এবং নির্বাচনে প্রতিযোগীতার জন্য প্রস্তুত হন। নির্বাচনী প্রচার কাজে ফজলুল হক ও তাঁর দলের প্রার্থীদেরকে লীগের অনুরক্ত ছাত্রদের তীব্র বিক্ষোভ ও বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়।[৫৫]

মুসলিম লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে যথারীতি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি ও যৌক্তিকতা তুলে ধরে। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ইশতেহারে আরো বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল পূর্ব বাংলার মুসলমানরা তাঁদের জীবন ও ধর্মীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেন। মুসলিম লীগ ইশতেহারে জমিদারি প্রথা বাতিল, কৃষি সংস্কার, খাদ্য সংকট দূরীকরণ, পাটের ন্যায্য বাজার দর নির্ধারণ, প্রধান শিল্প জাতীয়করণ, কুটির শিল্পের বিকাশ, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু, মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার প্রসারের প্রতিশ্রুতি দেয়।[৫৬] অন্যদিকে কংগ্রেসের ইশতেহারের মূল উপজীব্য ছিল অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠা। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহার তুলনা করলে মুসলিম লীগের প্রতিশ্রুতি সাধারণ মানুষ ও মুসলমান ভোটারদেরকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। অন্যদিকে

ফজলুল হকের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা থাকলেও তাঁর কৃষক প্রজা পার্টি পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন না করায় মুসলিম ভোটারদের বড় অংশের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। এর ফলে নির্বাচন মূলত কংগ্রেস বনাম মুসলিম লীগের নির্বাচনে পরিণত হয়।[৫৭]

১৯৪৬ সালের ১৯-২২ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় আইন পরিষদের ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ সর্বোচ্চ ১১৪টি আসন লাভ করে। কংগ্রেস ৮৬টি এবং কৃষক শ্রমিক পার্টি মাত্র ৪টি আসন পায়। অথচ মুসলিম লীগ ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ৩৭টি, কংগ্রেস ৩৯টি এবং কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫টি আসন পেয়েছিল।[৫৮] প্রদেশগুলোর মোট ৪৮২টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ৪২৩টি আসনে জয়ী হয়। কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে দলটি পেয়েছিল মাত্র ১০৪টি আসন। বঙ্গীয় পরিষদে মুসলিম লীগের সাফল্য ছিল অভূতপূর্ব। মোট প্রদত্ত ভোট ২৪,৩৪,১০০ এর মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ২০,৩৬,৭৭৫ ভোট। অর্থাৎ মোট ভোটের ৮৩.৪% মুসলিম লীগ লাভ করে। কৃষক প্রজা পার্টির শতকরা ৬৫.১% প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।[৫৯]

সারণি-৫ঃ বঙ্গীয় আইন পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল (১৯৪৬)[৬০]

দলের নাম	প্রাপ্ত আসন
মুসলিম লীগ	১১৪
কংগ্রেস	৮৬
ইউরোপিয়ান	২৫
কৃষক প্রজা পার্টি	৪
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৪
কমিউনিষ্ট পার্টি	৩
ভারতীয় খ্রিষ্টান	২
হিন্দু মহাসভা	১
ইমারত পার্টি	১
ক্ষত্রিয় সমিতি	১
তফসিলি ফেডারেশন	১
হিন্দু স্বতন্ত্র	৬
মুসলমান স্বতন্ত্র	২
মোট	**২৫০**

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে দুটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়; (১) লীগের এ দাবি সত্য প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় ও ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। (২) নির্বাচনের রায়ে প্রমাণ হয় যে, মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন আছে।[৬১]

নির্বাচনের পরপরই সোহরাওয়ার্দী সর্বসম্মতিক্রমে লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২ এপ্রিল বাংলার নতুন গভর্নর ফ্রেডারিক বারোজ সোহরাওয়ার্দীকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহবান জানান। যদিও নির্বাচনের সামগ্রিক ফলাফলের ভিত্তিতে সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে এককভাবে মন্ত্রিসভা গঠনে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপটে তিনি কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ নিলে উভয় দলের হাইকমান্ডের সমর্থন না থাকায় তা ব্যর্থ হয়। অবশেষে সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল ৭জন মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য এবং ১জন তফসিলী হিন্দু সদস্যসহ মোট ৮ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করেন।[৬২] নভেম্বরে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করে ১৩জনে উন্নীত করা হয়। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে এটাই ছিল একমাত্র মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা।

সারণি-৬ঃ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা (১৯৪৬-১৯৪৭)[৬৩]

নাম	মন্ত্রণালয়
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আহমদ হোসাইন	কৃষি মন্ত্রণালয়
খান বাহাদুর আবদুল গোফরান	বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়
খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলী	অর্থ, জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
খান বাহাদুর মোয়াজ্জেম হোসাইন	শিক্ষা, রাজস্ব মন্ত্রণালয়
শামসুদ্দিন আহমদ	বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প মন্ত্রণালয়
যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল	বিচার, পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ
তারকানাথ মুখার্জী (বর্ণ হিন্দু)	অর্থ মন্ত্রণালয়
নগেন্দ্রনারায়ন রায় দ্বারকানাথ বাড়ৈ (তফসিলী)	আইন মন্ত্রণালয়
ফজলুর রহমান	রাজস্ব মন্ত্রণালয়
খান বাহাদুর এ.এফ.এম আবদুর রহমান	সমবায় ও সেচ মন্ত্রণালয়

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভায় চারজন প্রাক্তন মন্ত্রী ও চারজন খান বাহাদুর খেতাবধারী অন্তর্ভুক্ত হলেও মূলত এ মন্ত্রিসভা মধ্যবিত্ত স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে। সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভায় খাজা নাযিমুদ্দীন গ্রুপের প্রভাবশালী সদস্য ও প্রাক্তন চিফ হুইপ ফজলুর রহমান অন্তর্ভুক্ত হন এবং অপর সদস্য নুরুল আমীন হন স্পিকার। ১৩জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির মধ্যে অন্তত ৫জনকে এ গ্রুপ থেকে নেয়া হয়। মন্ত্রিসভার আরো একটি দিক হচ্ছে মন্ত্রিসভায় এতোদিন অধিকসংখ্যক হিন্দু সদস্য নেয়া হলেও তাঁর মন্ত্রিসভায় মাত্র ৩জন হিন্দু ছিলেন, তাও আবার তফশিলী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নির্বাচিত।[৬৮]

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা শুধু বিনা বিচারে আটক রাজবন্দিদের মুক্তি দান, বিশেষ করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামি যারা দীর্ঘদিন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কারাদন্ড ভোগ করছিলেন তাদের মুক্তির ব্যবস্থা ছাড়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ করতে ব্যর্থ হয়। কারণ মন্ত্রিসভা গঠনের শুরু থেকেই খাজা সমর্থকদের মালিকানাধীন তিনটি প্রভাবশালী পত্রিকা দৈনিক আজাদ, স্টার অব ইন্ডিয়া এবং মর্নিং নিউজ শীতল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং সময় বিশেষে প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকে। মন্ত্রিসভার একমাত্র সমর্থক আবুল হাশিমের সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' জনমত গঠনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি।[৬৫] তাছাড়া, ১৫ মাস ক্ষমতায় থেকেও এ মন্ত্রিসভা আইনগত কোনো বিধান রচনা করতে পারেনি। এসময় বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে 'তেভাগা আন্দোলন' নামে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন চলছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভা কর্তৃক বঙ্গীয় আইনসভায় 'Bengal Provisional Control Bill' উত্থাপন করা হলেও তা ব্যর্থ হয়। এরপর ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে ফজলুল হকের ১ম মন্ত্রিসভার আমলে গঠিত জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির বিষয়টি পুনরায় উত্থাপিত হলেও বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তা আইনে পরিণত হতে পারেনি।[৬৬]

প্রকৃতপক্ষে, সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার কার্যকাল বাংলার ইতিহাসে ছিল খুবই ঘটনাবহুল। এসময় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, অখন্ড বাংলা রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম, দেশ বিভাগ, পাকিস্তান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসনের অবসানকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতি আবর্তিত হতে

থাকে। ফলে নির্বাচনের পূর্বে ও পরে মুসলিম লীগের কাছে মুসলমানরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে উন্নয়নের ধারা প্রত্যাশা করেছিল তার প্রাপ্তি ছিল খুবই সামান্য। পূর্ববাংলার প্রত্যাশার এ অপ্রাপ্তির প্রধান কারণ ছিল দুটি। (১) মুসলিম লীগের হাই কমান্ডের তদারকি ক্ষমতা এবং (২) লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রচেষ্টা।[৬৭]

৫.৩ মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম ও মুসলিম লীগের কার্যক্রম

১৯৪০ সালের যুগান্তকারী লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে মুসলমানদের চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। মুসলিম লীগ অখন্ড ভারতের পরিকল্পনা থেকে সরে গিয়ে হিন্দু ও মুসলমান এ দুই জাতির ভিত্তিতে ভারত বিভাগ দাবি করে। লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পরবর্তীতে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে অভিহিত হয়। যেহেতু কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকার অখন্ড ভারতের পক্ষে ছিল তাই মুসলিম লীগকে পাকিস্তান দাবি আদায়ের পথে এ দুই বিরুদ্ধে শক্তির সাথে সংগ্রাম করতে হয়।[৬৮]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে সামরিক ও প্রশাসনিক সমস্যা সৃষ্টির ফলে মূলত ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার বিষয়ে ভারতীয় নেতাদের সহযোগিতা লাভের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ সালের ৮ই আগষ্ট একটি প্রস্তাব করেছিল যা 'আগষ্ট প্রস্তাব' নামে খ্যাত। বড় লাটের কর্মপরিষদের সম্প্রসারণ, যুদ্ধ উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, যুদ্ধ শেষে সাংগঠনিক সভা গঠন এবং ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা আগষ্ট প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি এ প্রস্তাবকে সন্তোষজনক মনে করেনি। কংগ্রেসও এটি অগ্রাহ্য করে।[৬৯]

এরপর ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি স্যার উইন্সটন চার্চিল তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপসকে একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাসহ ভারতে পাঠান। ক্রীপস ৩০ মার্চ তাঁর শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য সংবিধানসভা গঠন, প্রদেশগুলোর ইচ্ছাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সুযোগ, শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার গঠন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ক্রীপস প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থ স্বীকৃত না হওয়ায় এ প্রস্তাব মুসলিম লীগের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। এতে কংগ্রেসের দাবিও ক্ষুন্ন হয়, তাই এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ৮ আগষ্ট থেকে কংগ্রেস নেতারা সারা দেশে 'ভারত ছাড়' (Quit India) আন্দোলন শুরু করে।[৭০] ফলে অনেক কংগ্রেস নেতাকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করে। এসময় মুসলিম লীগ আরো শক্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ পায় এবং ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে হিন্দু মহাসভার সাধারণ কর্মসচিব রাজা মহেশর দয়াল শেট এবং কংগ্রেস নেতা সি. রাজা গোপালাচারিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রেক্ষিতে একটি শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা রচনা করেন যা 'সি.আর. ফর্মুলা' নামে পরিচিত। কিন্তু ১৯৪৪ সালের ১০ জুলাই লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় জিন্নাহ এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। এরপর তেজবাহাদুর সাপরু আর একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। জিন্নাহ এ প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করেন এবং বলেন যে, মুসলিম লীগ অখন্ড ভারতের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে না।[৭১]

১৯৪৫ সালের জুন মাসে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বড়লাট লর্ড ওয়াভেল একটি অন্তর্বর্তী সরকারের পরিকল্পনা রচনা করেন। ব্রিটিশ সরকার এটি অনুমোদন করে। ১৪ জুন এ পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয় এবং এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ২৫ জুন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের নিয়ে সিমলায় এক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়।

ফলে সিমলা বৈঠকও ব্যর্থ হয়ে যায়।[৭২] এভাবে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হতে থাকলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও লীগের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি পরীক্ষা করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেই ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে।

মূলত, ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্বের দাবির পরীক্ষা হয়। কংগ্রেস অখন্ড ভারতের আদর্শে এবং মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও লীগের পরস্পর বিরোধী দাবির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রয়াস পায়।[৭৩] ইতোমধ্যে ১৯৪৬ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি লর্ড এটলী ঘোষনা করেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতে একটি মন্ত্রিমিশন (Cabinet Mission) প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং ভারত সচিব লর্ড পেথিকলরেন্স, বাণিজ্য বোর্ডের সভাপতি স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রীপস ও নৌবহরের সচিব এ. ভি. আলেকজান্ডার এর সদস্য থাকবেন। এ মন্ত্রিমিশন ভারতীয় নেতাদের সাথে শাসনতান্ত্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পদ্ধতি, সংবিধানসভা গঠন ও বড়লাটের শাসন পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।[৭৪]

১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ করাচী হয়ে মন্ত্রিমিশন ২৪শে মার্চ দিল্লি পৌঁছান। তাঁরা রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা, প্রদেশগুলোর প্রধানমন্ত্রি, সংখ্যালঘুদের নেতা ও দেশীয় রাজ্যগুলোর রাজাদের সাথে আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় করেন। কংগ্রেসের সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ৩ এপ্রিল মন্ত্রিমিশনের সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর মহাত্মা গান্ধীও মিশনের সাথে সাক্ষাত করেন। ৪ এপ্রিল লীগ সভাপতি মুহম্মদ আলী জিন্নাহ মন্ত্রিমিশনের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাবি করেন এবং এর পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেন।[৭৫]

মন্ত্রিমিশন ভারতে আসার পর জিন্নাহ আইনসভাগুলোর সদস্যপদ নিয়ে একটি কনভেনশন আহ্বানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ৭-৯ এপ্রিল দিল্লিতে কনভেনশন আহ্বান করেন যা 'Delhi Muslim Legislator's Convention' নামে পরিচিত। মুসলিম লীগের নবনির্বাচিত সদস্যসহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভা থেকে প্রায় ৫০০ সভ্য এ বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকের উদ্বোধনী বক্তৃতায় জিন্নাহ পাকিস্তান দাবির বিবরণ দেন। ৮এপ্রিল বৈঠকে প্রত্যেক প্রদেশের শতকরা ১০জন সদস্য নিয়ে একটি বিষয় কমিটি গঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম বাংলা প্রদেশের পক্ষে বিষয় কমিটির সভ্য হন এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এতে আসামের প্রতিনিধিত্ব করেন।[৭৬]

জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় নবাব ইসমাইল খানকে সভাপতি করে এবং এস. এ. এইচ. ইস্পাহানী, আব্দুল মতিন চৌধুরী, আই. আই. চুন্ডিগর এবং চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে সভ্যভুক্ত করে একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। এ সাব কমিটিকে কনভেনশনে উত্থাপনের জন্য প্রস্তাব রচনার ভার দেয়া হয়। চৌধুরী খালিকুজ্জামান প্রস্তাবের যে খসড়া প্রস্তুত করেন তার কিছু অংশ সংশোধন করে ৯ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী তা কনভেনশনের বৈঠকে উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবে বলা হয় যে, "উত্তর-পূর্ব ভারতের পূর্ববাংলা ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান 'পাকিস্তান অঞ্চল' নামে অভিহিত হবে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ এলাকাগুলো নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে এবং অবিলম্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রতিশ্রুতি দাবি করা হচ্ছে"।[৭৭] প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর কনভেনশনের সকল সদস্য একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। তাঁরা অঙ্গীকার করেন যে, পাকিস্তান আদায়ের জন্য তাঁরা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবেন।[৭৮]

মূলত, ৯ এপ্রিল কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) সংশোধন করে খসড়া প্রস্তাব রচনা করা হয়। লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র (Independent States) প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু কনভেনশনের প্রস্তাবে এ

প্রদেশগুলো নিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের (A Sovereign Independent State) দাবি করা হয়। একাধিক রাষ্ট্রের (States) স্থলে একটি রাষ্ট্রের (State) উল্লেখ করায়, বিষয় কমিটির সভায় আবুল হাশিম (বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের কর্মসচিব) প্রস্তাবটির সমালোচনা করে বলেন, "The Lahore resolution of 1940 does not contemplate one Pakistan state but it contemplates two independent and sovereign Pakistan states ……. The convention of the Muslim League legislatures is not competent to alter or modify the contents of the Lahore Resolution …….. which is now accepted as the creed of the Muslim League."[৭৯]

আবুল হাশিমের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিষয় কমিটির সভাপতি হিসাবে জিন্নাহ মন্তব্য করেন যে, "I see, Maulana Saheb (as Jinnah called Abul Hashim) is banking upon the plural 's' which was an obvious printing mistake."[৮০] কিন্তু যখন মুসলিম লীগের ১৯৪০ সাল থেকে পরবর্তী বছরের প্রস্তাব ও কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয় তখন দেখা যায় যে সর্বত্রই States শব্দটি রয়েছে, অক্ষরটি টাইপের ভুল নয়। এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী লিখেছেন যে, এরপর জিন্নাহ বলেন, "I do not want one Pakistan state but I want one Constituent Assembly for the Muslims of India …….. What really mattered was the intention and not the word. Infact the records be rectified."[৮১]

এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী মত প্রকাশ করেন যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে অস্পষ্টতা ছিল, কনভেনশনের প্রস্তাবে তা দূর করে প্রস্তাবটিকে সুস্পষ্ট করা হয়। এরপর জিন্নাহ কাগজপত্রে 'States' এর জায়গায় 'State' করার নির্দেশ দেন।[৮২] যদিও মনে করা হয় যে, কনভেনশনের প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাবের মৌলিক পরিবর্তন করা হয়নি, শুধু শব্দের পরিবর্তন করে এর ভাষা স্পষ্ট করা হয়েছে, তবু প্রশ্ন থাকে যে, কনভেনশনের কি মুসলিম

লীগের প্রস্তাব পরিবর্তন করার অধিকার বা ক্ষমতা ছিল? যেহেতু মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রের মধ্যে কনভেনশনের কোন স্থান ছিল না, তাই একমাত্র মুসলিম লীগ পরিষদেরই এ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু কনভেনশন সমাপ্তির পরের দিন, ১০ এপ্রিল মুসলিম লীগ পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলেও বৈঠকে লাহোর প্রস্তাব বা কনভেনশনের প্রস্তাবটি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়নি। মুসলিম লীগ পরিষদের প্রস্তাব সংশোধন সম্পর্কে এড়িয়ে যাওয়ার এ ব্যাপারটি খুবই দুর্বোধ্য বলে মনে করা হয়।[৮৩]

কনভেনশনের পর মন্ত্রিমিশন ১৬ এপ্রিল পুনরায় জিন্নাহর সাথে আলোচনায় বসেন। কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ায় মন্ত্রিমিশন কয়েক দিনের জন্য কাশ্মীরে বিশ্রাম নেন। ২৬এপ্রিল ক্রীপস মাওলানা আযাদ ও জিন্নাহর সাথে পৃথক ভাবে মন্ত্রিমিশনের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। এ আলোচনার ভিত্তিতে ৫-১১মে পর্যন্ত সিমলায় মন্ত্রিমিশনের সাথে কংগ্রেস ও লীগের বৈঠক হয়। এ বৈঠকেও আপোষমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৮৪] এরপর ১৬মে মন্ত্রিমিশন নিজেদের রচিত পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তাঁরা পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য করেন এবং বলেন যে, এর দ্বারা সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হবেনা এবং পাকিস্তানের দুটি অংশ একে অন্যের কাছ থেকে সাতশত মাইল ব্যবধানে থাকবে। মন্ত্রিমিশন তিনটি তবক বিশিষ্ট শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব করেন। অর্থাৎ প্রদেশগুলোকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয় (ক) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, উড়িস্যা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ; (খ) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তান; (গ) বাংলা ও আসাম, এ তিনটি গ্রুপ নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র (Union) গঠিত হবে। দেশ রক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও যানবাহন এর শাসনাধীন থাকবে।[৮৫] শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হবে এবং এটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে তিনটি তবকের ক্ষমতা নির্ধারণ করবে। কোন সাম্প্রদায়িক বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভার উভয় প্রধান সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য সদস্যদের উপস্থিতি ও সমর্থন আবশ্যক হবে। প্রতি দশ বছর পর প্রাদেশিক আইনসভার সংখ্যাধিক্য সদস্যগণ ইচ্ছা করলে শাসনতন্ত্রের শর্তগুলো পুনর্বিবেচনা দাবি

করতে পারবে। এছাড়া মন্ত্রিমিশন একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্যও সুপারিশ করেন।[৮৬]

বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে ১৬মে নিজেদের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ঘোষণায় বলা হয় যে, বড়লাটের শাসন পরিষদ ১৪জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে এবং এদের মধ্যে ৬জন কংগ্রেস, ৬জন মুসলিম লীগ, ১জন ভারতীয় খ্রিষ্টান, ১জন শিখ ও ১জন পার্সি সম্প্রদায় থেকে নেয়া হবে। ২৫ জুন লীগ কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বড়লাট তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে পারেনি। ১০ জুলাই কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি জওহরলাল নেহেরু এক সাংবাদিক বিবৃতিতে বলেন যে, কংগ্রেস গণপরিষদে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং কংগ্রেস মনে করে যে, এটি গণপরিষদে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা প্রয়োজনে রদবদল ও সংশোধন করতে পারবে।[৮৭]

জওহরলাল নেহেরুর এ বিবৃতির পর মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে নতুন জটিলতা সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ এ ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন অনুভব করে। ২৭জুলাই বোম্বাই শহরে লীগ পরিষদের বৈঠক আহ্বান করা হয়। বৈঠকে লীগ পরিষদ গণপরিষদে যোগদান করা বিপজ্জনক বলে মনে করেন এবং মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। বৈঠকে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য মুসলমানদের সরকারী উপাধি বর্জন করার এবং সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার নীতি সক্রিয় করার জন্য লীগ পরিষদ কার্যনির্বাহক কমিটিকে একটি কর্মসূচী তৈরী করার নির্দেশ দেয়। বৈঠকে ১৬আগষ্ট 'প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস' (Direct Action Day) নির্ধারণ করা হয়।[৮৮]

প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবসের কর্মসূচী অন্যান্য প্রদেশ সহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগে অন্তর্ভুক্ত হয়। এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীর লীগ মন্ত্রিসভা পূর্ববাংলায় ১৬আগষ্ট দিনটিকে সরকারী ছুটির দিন

হিসেবে ঘোষণা করে। এছাড়া বঙ্গীয় লীগ কয়েকটি ধাপে কর্মসূচী গ্রহণ করে; (১) মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করে সরকারী নীতি ও মনোভাবের প্রতি মুসলমানদের অসন্তোষ প্রকাশ এবং পূর্ণদিবস হরতাল পালন; (২) মসজিদ ও জনসভায় প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান; (৩) মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ প্রার্থনা ও মুনাজাত; (৪) শান্তিপূর্ণভাবে সভা ও বক্তৃতার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মপন্থা দিবস পালন এবং সর্বোপরি অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে এদিন হরতাল পালনে সহযোগীতার আহ্বান।[৮৯]

১৬আগষ্ট মুসলমানরা ভারতের সর্বত্র হরতাল ও সভার আয়োজন করে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস পালন করে। এদিন লীগ নেতারা কলকাতা ময়দানে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করেন। কিন্তু সভা শুরু হওয়ার আগেই কলকাতার বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়। ইস্পাহানী লিখেছেন যে, সভার আয়োজনের সময় সার্কুলার রোড ও কর্পোরেশন রোডের সংযোগস্থলে হিন্দুরা হঠাৎ মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর রাস্তার দুইপাশের বাড়ীগুলো থেকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এরকম আরও কয়েকটি স্থানে হাঙ্গামার খবর আসে এবং বিকাল ৩টার দিকে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ভবানীপুর এলাকার শিখ ও হিন্দুরা সেখানে মুসলিম মহিলা ও শিশুদের উপর আক্রমণ চালায়। এভাবে অনেকগুলো অঞ্চল থেকে হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া যায় এবং দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।[৯০]

কলকাতার স্টেটসম্যান সম্পাদক আয়ান স্টিফেনস কলকাতা দাঙ্গার গূঢ় কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। তিনি লিখেছেন যে, মুসলমানরা হিন্দুদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে, এমন জনরব শুনে হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলো বড় আকারে প্রতি আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। কলকাতায় ৪ দিন দাঙ্গার প্রথম দিন আকস্মিক আক্রমণে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং দ্বিতীয় দিন থেকে শিখরা হিন্দুদের সাথে যোগ দেয়। স্টিফেনস কলকাতা দাঙ্গার ভয়ঙ্কর নরহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ দিয়ে লিখেন যে, শ্যামপুকুর ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মানুষের মৃতদেহের স্তূপ নিকটস্থ বাড়ীগুলোর দোতলার মেঝ বরাবর উঁচু হয়ে উঠেছিল।[৯১]

স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর হিসেবে কলকাতা দাঙ্গায় প্রায় ৫০০০০ লোক হতাহত হয়েছিল। ভি. পি. মেননের মতে, ৫০০০ নিহত ও ১৫০০০ আহত হয়।[৯২] হিন্দু নেতারা দাঙ্গার জন্য এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী ও লীগ নেতাদের দায়ী করেন। অন্যদিকে লীগ নেতারা মনে করেন যে, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা এ দাঙ্গার জন্য দায়ী। স্টিফেনস কলকাতা হত্যাকান্ডের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, কলকাতার দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের লোকদের মনে রাজনৈতিক আশা ও ভয়ের উদ্রেক করা হয়েছিল এবং দাঙ্গার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব থেকে যে উত্তেজনাকর সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে কলকাতা হত্যাকান্ডের মূল কারণ নিহিত ছিল।[৯৩]

কলকাতা দাঙ্গার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। লর্ড ওয়াভেল কলকাতা দাঙ্গার বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারেন এবং এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি থেকে দেশকে রক্ষার জন্য তিনি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। এ উদ্দেশ্যে ২৭আগষ্ট তিনি গান্ধী ও নেহেরুর কাছে কেন্দ্রে ও বাংলায় কংগ্রেস ও লীগের যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু গান্ধী ও নেহেরু এ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় এবং বৃটেনের শ্রমিক সরকারের নির্দেশে বাধ্য হয়ে ওয়াভেল কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সরকারকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। স্টিফেনস লিখেছেন যে, কলকাতা দাঙ্গা এবং মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সরকার গঠন; এ দুটি ঘটনার ফলে ভারতে ষোল মাস ব্যাপী অন্তর্যুদ্ধ শুরু হয়।[৯৪]

কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ২সেপ্টেম্বর মুসলিম নেতারা ভারতের সর্বত্র ‘কৃষ্ণ দিবস’ পালন করেন এবং কালো পতাকা উত্তোলন করে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। কলকাতা দাঙ্গার খবর পূর্ববাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে অক্টোবর মাসে নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। এ দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসেবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার উদ্যোগে বিহারে ’নোয়াখালী দিবস’ পালিত হয় এবং ৩০অক্টোবর থেকে ৭নভেম্বর

পর্যন্ত মুসলমানদের হত্যা করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী ১৫০০০ এবং মুসলিম লীগের মতে ৩০০০০ লোক বিহার দাঙ্গায় প্রাণ হারায়।[৯৪] বিহারের পরে ভারতের অনেক স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। ২৫-৩০অক্টোবরের মধ্যে শুধু কলকাতায় ১১৭জন নিহত ও ৪৫৬জন আহত হয়।[৯৫]

অন্তর্যুদ্ধের ভয়াবহতা বাড়তে থাকলে মুসলিম লীগ নেতারা মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৫অক্টোবর বড়লাট লীগের ৫জন সদস্যকে অন্তর্বর্তী সরকারে অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন; লিয়াকত আলী খান, সর্দার আব্দুর রব নিশতার, রাজা গজানফর আলী খান, আই আই চন্ডিগড় এবং যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল।[৯৬] কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি ও লীগের অসহযোগীতার কারণে শাসন ব্যাপারে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এরপর ৯ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ও ২০জানুয়ারী(১৯৪৭) দ্বিতীয় অধিবেশন আহবান করা হয়। মুসলিম লীগ অধিবেশনে যোগদান করেনি। লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি গণপরিষদে গৃহীত 'উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রস্তাবের' নিন্দা করে এবং একে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে।[৯৭]

এরপর ভারতের প্রশাসনিক সমস্যা ও রাজনীতির সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে লর্ড এটলী ২০ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য দৃঢ়সংকল্প করেছে। এ ঘোষণার পর মার্চ মাসের ২২তারিখ লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে বুঝতে পারেন যে, মন্ত্রিমিশনের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এবং ভারত বিভাগ ছাড়া হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের সমাধান করার অন্য কোন পথ নেই। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস ও লীগ সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতানৈক্যের কারণে কংগ্রেস নেতাদের মনেও ভারত বিভাগের পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন যে, মাউন্ট ব্যাটেন নেহেরু ও বল্লবভাই প্যাটেলকে একথা বুঝাতে সমর্থ হন যে, লীগের সাথে একত্রে কাজ করতে গিয়ে

ভারতের ঐক্য ও শান্তি বিপন্ন করার চেয়ে মুসলমানদেরকে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ছেড়ে দেয়া সমীচীন হবে।[৯৮]

কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটি ৮মার্চ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সভায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব করে। এলান কেম্পবেল জনসনের মতে, কংগ্রেসের পাঞ্জাব বিভাগ প্রস্তাব থেকে নেতাদের ভারত বিভাগ পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রথম আভাস পাওয়া যায়।[৯৯] এরপর মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগ প্রস্তাবের সাথে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগেরও প্রস্তাব করেন। মূলত, বড়লাট ও কংগ্রেস নেতারা পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের দাবিকে লীগের পাকিস্তান দাবির বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, যদি জিন্নাহ পাঞ্জাব ও বাংলার কিছু অংশ পেয়ে সন্তুষ্ট না হন তাহলে তিনি পাকিস্তান দাবি ছেড়ে দিবেন এবং মুসলিম লীগকে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে উপদেশ দিবেন। কারণ পর্যবেক্ষকদের মধ্যে এমন ধারণা জন্মেছিল যে, খন্ডিত পাকিস্তান অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এত দুর্বল হবে যে, এ রাষ্ট্রের টিকে থাকা অসম্ভব হবে।[১০০]

মাউন্টব্যাটেনের সাথে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পরেও জিন্নাহ পাকিস্তান দাবি থেকে সরে যাননি। বরং নেহেরু, প্যাটেল, গান্ধী ভারত বিভাগ মেনে নিতে প্রস্তুত হন। মাউন্টব্যাটেন তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করে একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনা করেন। এ পরিকল্পনায় প্রদেশগুলোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করা হয় এবং বলা হয় যে, ইচ্ছা করলে প্রদেশগুলো উপ-যুক্তরাষ্ট্র (Confederation) গঠন করতে পারবে। পরিকল্পনায় ভারত বিভাগের সাথে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতি ও প্রণালী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়।[১০১]

১৫ ও ১৬এপ্রিল গভর্নরদের বৈঠকে মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। লন্ডনে এটলি সরকার কিছু সংশোধন করে এটি অনুমোদন করেন। কিন্তু নেহেরুর আপত্তির ফলে পরিকল্পনাটি বাতিল হয় এবং পুনরায় তা রচিত হয়।[১০২] এবার মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা

প্রণয়নের ভার তাঁর শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ভি.পি. মেননের উপর ন্যাস্ত করেন। মেনন তাঁর পূর্ব প্রস্তাব অনুযায়ী খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং ১৮মে পরিকল্পনা নিয়ে মাউন্টব্যাটেন নিজে লন্ডনে যান। এটলি সরকারের অনুমোদন নিয়ে ৩১মে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।[১০৩] এরপর ২জুন মাউন্টব্যাটেন নেহেরু, প্যাটেল, জে. বি. কৃপালনী, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী, আব্দুর রব, নিশতার ও বলদেও সিংহ; এ সাত জন নেতাকে এক বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন। তিনি তাঁর শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিয়ে তাঁদের সাথে আলোচনা করেন। মাউন্টব্যাটেন বৈঠকে সবার সম্মতি লাভ করতে অসমর্থ হন। ৩জুন পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হয় এবং কংগ্রেস ও লীগ নেতারা বেতার ভাষণে আপোষমূলকভাবে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। ৪জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে মাউন্টব্যাটেন জানান যে, ১৫আগষ্ট ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।[১০৪] মুসলিম লীগ পরিষদ ১০জুন পরিকল্পনাটি আপোষমূলকভাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।[১০৫]

৪জুলাই (১৯৪৭) ভারত স্বাধীনতা আইনের খসড়া ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। এ বিলে ভারতে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবে সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও পূর্ববাংলার কিছু অংশ নিয়ে 'পাকিস্তান' এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ নিয়ে 'ভারত' রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। বিলটি পার্লামেন্টে গৃহীত হলে ১৮জুলাই তা আইনে পরিণত হয়।[১০৬] নেহেরু ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে মাউন্টব্যাটেনের নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু মুসলিম লীগ গভর্নর জেনারেলের পদে জিন্নাহর নাম প্রস্তাব করে। এতে মাউন্টব্যাটেন কিছুটা অসন্তুষ্ট হন। ৭জুলাই জিন্নাহ দিল্লি থেকে করাচী যান এবং করাচীকে পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে মনোনীত করেন। ১১আগষ্ট করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং জিন্নাহ গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৩আগষ্ট মাউন্টব্যাটেন করাচী যান এবং ১৪আগস্ট তিনি গণপরিষদ সভার অভিভাষনে পাকিস্তানকে রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের শপথ গ্রহণ করেন।[১০৭] এভাবে মুসলিম লীগের আপোষহীন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র জন্মলাভ করে।

৫.৪ স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, বাংলা বিভক্তি ও মুসলিম লীগের ভূমিকা

মুসলিম লীগ যখন ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান দাবির ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে তখন এ দাবিকে প্রতিরোধ করার জন্য কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব করেন।[১০৮] ব্রিটিশ সরকারও ভারত বিভাগের পক্ষপাতি ছিল না। তাঁরা যে কোন প্রকারে ভারতের রাজনৈতিক অখন্ডতা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালে ভয়াবহ দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হলে এবং অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের তীব্র মতবিরোধের কারনে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। ফলে কংগ্রেস ভারত বিভাগ ছাড়া অন্য কোন পথ দেখতে পায় না। আয়ান স্টিফেনস লিখেছেন, ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এমন দাবি আসতে থাকে যে, যদি প্রকৃতই উপমহাদেশ বিভক্ত করা হয়, তাহলে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশও বিভক্ত করতে হবে।[১০৯]

মার্চ মাসে (১৯৪৭) পাঞ্জাবে অন্তর্যুদ্ধ ভয়ঙ্করভাবে ছড়িয়ে পড়লে ৮মার্চ কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সভায় পাঞ্জাবের মর্মান্তিক ঘটনা বিবেচনা করে একটি প্রস্তাব পাশ করে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাবকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, তাই প্রদেশটিকে এভাবে ভাগ করতে হবে যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান অঞ্চল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চল থেকে পৃথক হয়ে যায়।[১১০] ৯মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি জে.বি. কৃপালনী বলেন যে, কংগ্রেস অখন্ড ভারতে বিশ্বাসী; কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয় এবং যদি লোকে পরস্পরকে হত্যা করে তাহলে কংগ্রেস পাঞ্জাবকে দুটি প্রদেশে ভাগ করার সুপারিশ করবে। তিনি আরও বলেন যে, যদি বাংলায়ও এমন অবস্থা চলে তবে বাংলা বিভাগের জন্যও কংগ্রেস দাবি জানাবে।[১১১] এ ব্যাপারে ১২মার্চ এক বিবৃতিতে জওহরলাল নেহেরু বলেন, "In the event of the Muslim League not accepting the Cabinet Delegation's Scheme and not coming

into the Constituent Assembly, the division of Bengal and Punjab becomes inevitable."[১১২]

অন্যদিকে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেসের বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবিকে চক্রান্তমূলক বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, "মুসলমানরা পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, বাংলা ও আসাম নিয়ে তাঁদের আবাসভূমি ও জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের দাবি করছে। যদি পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত করা হয় তাহলে অন্যান্য প্রদেশকেও একই নীতিতে ভাগ করতে হয়; আর তা করলে প্রদেশগুলোর প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের মূলে আঘাত করা হবে।" তিনি প্রস্তাব করেন যে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে লোক বিনিময় করার ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহকে 'অখন্ড ভারত' অথবা 'খন্ডিত বাংলা ও খন্ডিত পাঞ্জাব', এ দুটির মধ্যে একটি পছন্দ করতে বলেন।[১১৩]

মূলত, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও অন্যান্য হিন্দু মহাসভার নেতারা প্রথমে বাংলা বিভাগের দাবি উত্থাপন করেন। সংবাদপত্র ও সভা সমিতির মাধ্যমে এ দাবি আদায়ের জন্য প্রচারকার্য চলতে থাকে। এর ফলে বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা বাংলা বিভাগের দাবি সমর্থন করেন এবং পূর্ববাংলার হিন্দুরা এর বিরোধীতা করেন। হিন্দু সংবাদপত্রগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হয়। বসুমতি ও যুগান্তর বাংলা বিভাগের জন্য প্রচারণা চালায়; অমৃতবাজার পত্রিকা এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকে; আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে।[১১৪] হিন্দু মহাসভার নেতারা বাংলা বিভাগের আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলেন। কংগ্রেস নেতাদের অনেকে তাঁদের মাধ্যমে প্রভাবিত হন। ৪এপ্রিল (১৯৪৭) বিষয়টি কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকে উত্থাপন করা হয়। এ সভায় বাংলাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করার প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হয়।[১১৫] ঐতিহাসিক এম.এ. রহিম বাংলা বিভাগের ব্যাপারে যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "এটি বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, যে হিন্দু

নেতাগন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বঙ্গভঙ্গ রদ করেছিলেন তাঁরাই আবার ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগের দাবি করেন। আর যে, মুসলমান নেতারা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হওয়ায় খুশি হয়েছিলেন তাঁরা আবার ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন।"

তবে কংগ্রেসের অন্যতম প্রবীন নেতা শরৎচন্দ্র বসু এবং আরোও কয়েকজন কংগ্রেস নেতা বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করেন। ১৫মার্চ 'এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার' প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাতকারে শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেসের পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগ প্রস্তাবের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কংগ্রেস, এর নীতি থেকে সরে গিয়েছে। তিনি মনে করেন যে, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপিত হতে পারে না।[১১৬] তফসিলী হিন্দুরাও বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে ছিল। অন্যতম তফসিলী হিন্দু নেতা জোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ২১এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে মত প্রকাশ করেন যে, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও পশ্চিম বাংলার অন্যান্য সাম্প্রদায়িক নেতারা বাংলার বিভাগ দাবি করতে পারেন; কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন না, নলিনীরঞ্জন সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ দাস, এ.এম. পোদ্দার ও পূর্ববাংলার অন্যান্য জমিদারগণ কি কারণে বঙ্গীয় কংগ্রেসের বাংলা বিভাগের প্রস্তাব সমর্থন করেছেন।[১১৭]

বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমান নেতাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাঁরা বাংলার অখন্ডতা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানে যোগ দিয়ে বাংলা স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা ভোগ করবে এটাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু হিন্দু নেতারা যখন বাংলার পাকিস্তান ভুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন তখন তা প্রতিরোধের জন্য মুসলমান নেতাদের অনেকে এ প্রদেশটিকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম প্রস্তাব করেন যে, পূর্ববাংলা পাকিস্তান বা হিন্দুস্তান কোন রাষ্ট্রেই যোগদান করবে না; এটি হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। প্রথমদিকে বাংলার অধিকাংশ মসুলমান নেতাই এ প্রস্তাবের পক্ষপাতি ছিলেন।[১১৮]

বঙ্গীয় আইনসভার স্পিকার নুরুল আমীন ১৬মার্চ (১৯৪৭) দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত লীগ সম্মেলনে বলেন, "বাংলা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। এ স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম পূর্ব পাকিস্তান অথবা বঙ্গ-আসাম যাই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। মুসলমানরা এ স্বাধীন রাষ্ট্র শাসন করবে। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের বেশে কোন প্রকার সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষ করবো না। আমরা আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা করবো। আমরা আমাদের জন্মগত অধিকারের উপর কারো হস্তক্ষেপ মেনে নিব না"।[১১৯] বঙ্গীয় কংগ্রেসের নেতা অখিল দত্ত বাংলা বিভাগের ব্যাপারে এক টেলিগ্রামে সর্দার প্যাটেলকে বলেন, "Partition of Bengal is fundamentally wrong on all grounds political, economic, cultural, linguistic, social. It is … misconceived remedy against Communal Government in Bengal."[১২০]

১৭মার্চ (১৯৪৭) ত্রিপুরা জেলার কিষাণপুরে এক জনসভায় বাংলার প্রধানমন্ত্রি এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী বাংলা বিভাগ করার প্রস্তাবের নিন্দা করেন এবং বলেন যে, ''বাংলা বাঙ্গালীদের এবং এদেশ অবিভাজ্য।'' এসময় তিনি বিবৃতি দেন যে, "মুসলমানরা অবশ্যই পাকিস্তান পাবে এবং বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে"।[১২১] এ বিবৃতি থেকে প্রকাশ পায় যে, প্রথমে সোহরাওয়ার্দী বাংলার পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি দেখতে পান যে, হিন্দু নেতাদের আন্দোলনের ফলে বাংলা বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়েছে তখন তিনি 'অখন্ড স্বাধীন বাংলা' রাষ্ট্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এরপর ৮এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "আমি সব সময় অখন্ড বাংলা ও বৃহৎ বাংলার পক্ষপাতি"। তিনি আশা করেন যে, বাংলা বিভাগের উদ্যোক্তাগণ বুঝতে পারবেন এবং মীমাংসায় আসার চেষ্টা করবেন, যাতে হিন্দু ও মুসলমানরা মিলিতভাবে বাংলাকে একটি মহান দেশ ও বাঙ্গালীদের এক মহান জাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।[১২১]

২৭এপ্রিল (১৯৪৭) সোহরাওয়ার্দী দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করেন। এ সম্মেলনে তিনি স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁর মতে অখন্ড বাংলা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করলে এর উন্নতির বিশাল সম্ভাবনা থাকবে। তিনি বলেন, "It will be a great country indeed, the richest and the most prosperous in India, capable of giving to its people a high standard of living, where a great people will be able to rise to the fullest height of their stature, a land that will truly be plentiful. It will be rich in agriculture, rich in industry and commerce and in course of time will be one of the most powerful and progressive states of the world."[১২৩]

সোহরাওয়ার্দী আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, যদি হিন্দুরা সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলা নীতি একবার মেনে নেয় তবে আমি তাঁদের আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্য বহুদূর পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছি। পূর্ববাংলা স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে টিকে থাকতে পারবে কিনা, সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এটি টিকে না থাকার কোন কারণ নেই। জনগণ এর জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে তার উপর নির্ভর করবে। পূর্ববাংলা ও আসামের যেটুকু অংশ পাওয়া যায় তা দিয়ে জনসাধারণ প্রয়োজনমত ত্যাগ স্বীকার করতে পারলেই তাঁরা স্বাধীন রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখতে পারবে।[১২৪]

১২মে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও মুহম্মদ আলী (বগুড়া) সোদপুর আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এরপর ১৪-১৫মে সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অখন্ড স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনার ব্যাপারে গান্ধী ও হিন্দু নেতাদের সাথে তাঁর সাক্ষাতের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।[১২৫] ১৬মে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে সোহরাওয়ার্দী জানান যে, তাঁর অখন্ড বাংলার পরিকল্পনা মুসলিম লীগ নেতারা বাতিল করে

দিয়েছেন বলে যে জনরব চলছে তা সত্যি নয়। তিনি বলেন যে, বাংলা যাতে বিভক্ত না হয় সেজন্য তিনি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চেষ্টা করবেন।[১২৬] তিনি আরও বলেন, "I have visualized all along… Bengal as an independent state and not part of any Union of India."[১২৭]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ কর্মসচিব আবুল হাশিম সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনার একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। ১মে এক সাংবাদিক বিবৃতিতে তিনি অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি সি.আর. দাসের বাংলা চুক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন যে হিন্দু ও মুসলমানরা এ চুক্তি অনুযায়ী শতকরা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা পাবেন এবং এরূপ শর্তে তাঁরা চুক্তিবদ্ধ হবেন। লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের ধর্মান্তরিত করে অথবা লোক স্থানান্তরিত করে একটি অখন্ড মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা অস্বাভাবিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি করার কথা এ প্রস্তাবে বলা হয়নি। এটি বাংলা ও ভারতের অন্যান্য কৃষ্টি বিশিষ্ট ইউনিটগুলোকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার দিয়েছে এবং সকলের মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছামত একটি ভারতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের সম্ভাবনার পথ খোলা রেখেছে"। তিনি মন্তব্য করেন যে, যদি বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের উপর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চাপ না থাকে, তবে তাঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও সন্তোষজনকভাবে নিজেদের বিষয়ে মীমাংসা করতে পারে। তিনি আরও বলেন, "উদ্ভূত সংকট নিরসনের পথ হচ্ছে গভীর দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন করা, একে বিভক্ত করা নয়।"[১২৮]

মাওলানা আকরাম খান এসময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি সরকারী লীগের মুখপাত্র ছিলেন। বাংলার হিন্দু মুসলমান প্রশ্নের ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদের সাথে আপোষ মীমাংসার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি একটি সাব-কমিটি গঠন করে।[১২৯] লীগের এ সাব-কমিটি কংগ্রেস নেতাদের সাথে কয়েকটি যুক্ত বৈঠকে আলোচনা করে। এরপর মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা সোহরাওয়ার্দীর

বাসভবনে ৩মে এক সভায় মিলিত হন এবং এ সভায় একটি যুক্ত কমিটি গঠন করেন। সোহরাওয়ার্দী, নাযিমুদ্দীন, আবুল হাশিম ও আরও তিনজন লীগ নেতা এবং শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় ও আরও চারজন কংগ্রেস নেতা যুক্ত কমিটির সভ্য মনোনীত হন। এ কমিটিকে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হয়।[১৩০]

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের যুক্ত কমিটি আলাপ আলোচনার পর আপোষ মীমাংসায় আসতে সমর্থ হয়। ২০মে শরৎ বসুর ১নং উডবার্ন পার্কের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় কমিটির সভ্যরা এ আপোষমূলক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।[১৩১] ২৩মে এক চিঠিতে শরৎবসু গান্ধীকে লিখেন, "গত মঙ্গলবার বিকেলে আমার বাড়ীতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়; সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, আব্দুল মালিক, ফজলুর রহমান, কিরণশঙ্কর রায় ও সত্যরঞ্জন বকশী এ সভায় যোগ দেন। আমরা একটি আপোষমূলক চুক্তি সম্পন্ন করেছি; আপনার বিবেচনার জন্য এ চুক্তির নকল চিঠির সাথে আপনাকে পাঠিয়ে দিলাম। চুক্তিটির নকলের পরিচয়ের জন্য আমি ও আবুল হাশিম এতে অন্যান্য সভ্যদের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করেছি। অবশ্য, চুক্তির বিষয়টি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানে উত্থাপন করতে হবে। আমার বিশ্বাস যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এটি অনুমোদন করবে, হয়ত সামান্য রদবদল হতে পারে। আমি এখনো মনে করি যে, যদি আপনার সাহায্য, উপদেশ ও নির্দেশ পায় তবে এ প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের আপোষমূলক চুক্তি অনুযায়ী চূড়ান্ত মীমাংসায় আসতে পারে। তাহলে আমরা বাংলার সমস্যা এবং একই সময়ে আসামের সমস্যাও সমাধান করতে পারব। ভারতের বাকি অংশেও এর শুভ প্রতিক্রিয়া হতে পারে"।[১৩২] এ চুক্তির নকল জিন্নাহর কাছেও পাঠানো হয়। মুসলিম লীগের পক্ষে আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের পক্ষে শরৎচন্দ্র বসু 'অখন্ড স্বাধীন বাংলা' রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। প্রায় সবগুলো পত্র-পত্রিকায় চুক্তির প্রস্তাবগুলো প্রকাশিত হয় এবং এটি 'সোহরাওয়ার্দী-বসু-রায়' চুক্তি বা ফর্মুলা নামে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে।[১৩৩]

নিম্নলিখিত শর্তগুলোর ভিত্তিতে সোহরাওয়ার্দী-বসু-রায় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল:

1. Bengal will be a free state. The Free State of Bengal will decide its relations with the rest of India.

2. The Constitution of the Free State of Bengal will provide for election to the Bengal Legislature on the basis of joint electorate and adult franchise, with reservation of seats proportionate to the population amongst Hindus and Muslims. The seats as between Hindus and Scheduled Caste Hindus will be distributed amongst them in proportion to their respective population or in such manner as may be agreed among them. The constituencies will be multiple constituencies and votes will be distributive and not cumulative…

3. On the announcement by His Majesty's Government that proposal of the Free State of Bengal has been accepted and that Bengal will not be partitioned, the present Bengal Ministry will be dissolved and a new Interim Ministry brought into being, consisting of an equal number of Muslims and Hindus (including Scheduled Caste Hindus) but excluding the Chief Minister. In this Ministry, the Chief Minister will be a Muslim and the Home Minister a Hindu

4. Pending the final emergence of a Legislature and a Ministry under the new constitution, the Hindus (including Scheduled

Caste Hindu) and the Muslims will have an equal share in the services, including the military and the police. The services will be manned by Bengalis.

5. A Constituent Assembly composed of thirty persons, sixteen Muslims and fourteen Hindus, will be elected by Muslim and non-Muslim members of the Legislature respectively, excluding the Europeans. [১৩৪]

কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ অখন্ড স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেননি। তাঁরা পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁদের মতে, ভারত বিভাগ করা হলে এ দুটি প্রদেশও বিভক্ত করতে হবে। শরৎচন্দ্র বসু ১জুন দিল্লিতে গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং স্বাধীন অখন্ড বাংলার পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, যদি কংগ্রেস এ পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তাহলে সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার পরিকল্পনায় মুসলিম লীগের অনুমোদন লাভ করতে পারবে। বাংলা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তির কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি তা বলি না যে, বাংলা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকবে। আমার বক্তব্য এই যে, ভারতের বাকি অংশের সাথে বাংলার কিরূপ সম্পর্ক হবে, সে বিষয়ে স্বাধীন বাংলা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে"।[১৩৫]

কংগ্রেস অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। শরৎবসুকে লেখা গান্ধীর ৮জুনের চিঠিতে তা প্রকাশ পায়। এ চিঠিতে গান্ধী লিখেন যে, "I have gone through your draft [tentative agreement]. I have now discussed the scheme roughly with Pandit Nehru and Sardar Patel. Both of them are dead against the proposal…. I see also that there is no prospect of a transfer of power outside the two parties of India." [১৩৬]

গান্ধী ঐক্যের জন্য শরৎবসুকে তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করে বাংলা বিভাগের বিরোধীতা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেন।[১৩৭] শরৎবসু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের এরূপ মনোভাবের কারণে নিরাশ হয়ে পড়েন। ৮জুন সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি মাউন্টব্যাটেনের ৩জুন পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেন এবং প্রদেশগুলোর ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করার ও এগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের দাবি করেন। তিনি বলেন যে, বাংলার রাজনীতি সচেতন হিন্দু-মুসলমান সকল অধিবাসী অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার ও নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র গণপরিষদ গঠনের পক্ষপাতি। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলেন যে, যদি বিষয়টি তাঁদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করা হয়, তাহলে কংগ্রেস কমিটির ও বাংলা আইনসভার অধিকাংশ সদস্য অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার জন্য স্বতন্ত্র পরিষদ গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করবে।[১৩৮]

সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসিমের স্বাধীন অখন্ড বাংলার পরিকল্পনা লীগ কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্য হয়নি। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আকরাম খান আসনের সংখ্যাসাম্য ও যুক্ত নির্বাচন প্রথা অনুমোদন করেননি। ১৪মে দিল্লিতে জিন্নাহর সাথে সাক্ষাতের পর সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় ফিরে আসলে ১৬মে আকরাম খান, নুরুল আমীন, হাবিবুল্লাহ বাহার, ইউসুফ আলী চৌধুরী এবং হামিদুল হক চৌধুরী বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য দিল্লি যান। ফিরে এসে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "Now we know in detail the views of the Quied-e-Azam are… The confusion created by unauthorized negotiations is now clarified. Mr. Jinnah told us in unequivocal terms that he did not authorize any one to make any commitment on behalf of the Muslim League…"[১৩৯]

২৩মে লীগ-কংগ্রেস যুক্ত কমিটি অখন্ড স্বাধীন বাংলার যে পরিকল্পনা গ্রহন করে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি তা অগ্রাহ্য করে। ২৯মে এক বৈঠকে এ মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়, "কার্যনির্বাহক কমিটি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চায় যে, কয়েকটি সংবাদপত্রে বাংলার

শাসনতন্ত্র সর্ম্পকে যে সকল প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর সাথে কার্যনির্বাহক কমিটি বা এর মনোনীত সাব-কমিটির কোন সংশ্রব নেই। পাকিস্তান দাবীর প্রতি কার্যনির্বাহক কমিটির অকুণ্ঠ বিশ্বাস রয়েছে"। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, "কমিটি কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থার পুনরাবৃত্তি করছে এবং প্রকাশ করছে যে, একমাত্র তিনিই ভারতের মুসলমানদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং বাংলার মুসলমানরা তাঁর সিদ্ধান্ত সবিনয়ে মেনে নিবে"।[১৪০]

মাউন্টব্যাটেনের ৩জুন পরিকল্পনায় ভারত বিভাগের সাথে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এটি গ্রহণ করে। জিন্নাহও আশ্বাস দেন যে, মুসলিম লীগও এ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। ৯জুন দিল্লীতে মুসলিম লীগ পরিষদের সভা আহূত হয়। মাওলানা আকরাম খান, সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, নাযিমুদ্দীন প্রমুখ প্রায় ৬০জন বাংলার সদস্য এ সভায় যোগ দেন। ইম্পিরিয়েল হোটেলে অনুষ্ঠিত সভায় জিন্নাহ পরিষদের সদস্যদের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন করে বলেন, "আপনারা কি আমাদের জীবিত থাকাকালে পাকিস্তান পেতে চান?" এসময় প্রায় সকল সদস্যই একস্বরে স্বীকার করেন। এরপর তিনি বলেন, "তাহলে আমার বন্ধুগণ আপনাদেরকে এ কীটদষ্ট ও সংকীর্ণ পাকিস্তান গ্রহণ করতে হবে"।[১৪১] সভায় মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থা স্বীকার করে নেয়া হয়।[১৪২]

মূলত, স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের নেতিবাচক মনোভাব ছাড়াও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বও দায়ী ছিল। অখন্ড স্বাধীন বাংলার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া ছিল সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ ও খাজা নাযিমুদ্দীন গ্রুপ। খাজা নাযিমুদ্দীনের সাথে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ ও মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সোহরাওয়ার্দীর অখন্ড বাংলা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় নাযিমুদ্দীন গ্রুপের জয় হয়। আর পরাজয় শুধু সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের নয় বরং গোটা বঙ্গীয় মুসলিম লীগের ও সাধারণ মানুষের

পরাজয়। কিন্তু এরপরেও সোহরাওয়ার্দী অখন্ড বাংলার ব্যাপারে চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।[১৪৩] বাংলার গভর্ণর ফ্রেডারিক বারোজ যুক্ত বাংলার দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেও ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন পরিস্থিতি বিবেচনা করে শেষ মুহূর্তে এ পরিকল্পনা নাকচ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৩আগষ্ট পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রি হিসাবে সোহরাওয়ার্দী তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং ১৪আগষ্ট 'পাকিস্তান' ও ১৫আগষ্ট 'ভারত' স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অংশে এবং পশ্চিমবাংলা ভারতের অংশে যুক্ত হয়ে যায়। স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের সকল স্বপ্ন ও প্রচেষ্টার এখানেই সমাপ্তি ঘটে।[১৪৪]

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালের জুন মাসে বাংলার সীমানা নির্ধারণের জন্য 'সীমানা কমিশন' গঠিত হয়েছিল। কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ বাংলার সীমানা ঘোষণা করেন। সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত পূর্ববাংলা অবিভক্ত বাংলার মোট ৬৩.৮% এলাকা এবং জনসংখ্যার ৬৪.৮৬% লাভ করে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মুসলিম লীগের নেতারা যে আশা-আকাঙ্খা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও বাংলা বিভক্তি চেয়েছিলেন সে আশা অপূর্ণই থাকে। কেননা ভারত বিভাগে মাউন্টব্যাটেন যেমন কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন তেমনি বাংলা বিভাগেও সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান সিরিল র‍্যাডক্লিফ ভারত সীমানার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন। যদিও এই অসম সীমানা সাময়িক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল; তবে দেশত্যাগ, সম্পদ বন্টন ইত্যাদি স্বার্থের আবর্তে তা চাপা পড়ে যায়। বাংলার মানুষ নতুন করে জীবন শুরু করে। যদিও পূর্ববাংলা এবার পাকিস্তানী শোষণের স্বীকার হয় কিন্তু ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালী জাতি এ পরাধীনতার অবসান ঘটায় এবং প্রমাণ করে যে, ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগ অযৌক্তিক ছিল।[১৪৫] মূলত, মুসলিম লীগের আপোষহীন রাজনীতির অভিজ্ঞতায় বাংলার জনগণ সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের শক্তি ও সাহস অর্জন করে ফলে আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একসময় পূর্ববাংলায় স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

তথ্যনির্দেশ

১। Harun-or-Rashid, The Foreshadowing of Bangladesh; Bengal Muslim League and Muslim Politics (1906-1947), The University Press Limited, Dhaka, 1987, P: 149.

২। এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), চতুর্থ প্রকাশ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ: ২৩০।

৩। Rangalal Sen, "Elite Conflict and Muslim Politics in Bengal" (1937-1947), New Delhi, 1986, P: 59.

৪। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৬।

৫। ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১), বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ: ১৫৮।

৬। The Progressive Coalition Party was formed on 28 November 1941 at a meeting of various opposition groups held at the Calcutta residence of J.C. Gupta. Fazlul Huq and Sarat Bose were elected its leader and deputy leader, respectively. See Herbert to Linlighgow, 5 December 1941, GPR, L/P & J/5/148.

৭। Jinnah's press statement on 11 December in Governor-General to Secretary of State for India, Telegram, 12 December 1941, Formation of New Government, P: 297.

৮। Only three members, namely Fazlul Huq (Chief Minister), Shyama Prasad Mookerjee and Nawab Khawaja Habibullah took the oaths of office on this date. Six more ministers were sworn in on 18 December. These arrangements were made by Herbert 'to gain time' to see whether the League could be included in the Ministry. See Governor of Bengal to Viceroy, Telegram, 9 December 1941, in Formation of New Government, L/P & J/8/651, P. 298.

৯। For list of Ministers and their portfolios, see Herbert to Linlithgow 20 December 1941.

১০। Dr. Shyama Prasad Mookerjee was born in 1901 and was educated at the Calcutta Presidency College and in London. He started his career as a lawyer in the Calcutta High Court. He was a member of the Bengal legislature from 1929 onwards. During 1934-38, he was the Vice-Chancellor of Calcutta University. In the 1937 elections, he was elected to the Bengal Assembly from the Calcutta University constituent, see Indian year book 1947, Vol: XXXIII, P:1158.

১১। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৯।

১২। Extract from private and personal letter from Linlithgow to Amery, 22 December 1941; Formation of New Government, P: 280.

১৩। Chaudhury Khaliquzzaman, Pathway to Pakistan, Lahore, 1961, P: 254.

১৪। এনায়েতুর রহিম, বাংলার স্বশাসন (১৯৩৭-১৯৪৩), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃঃ২৪৭।

১৫। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৯।

১৬। Kamruddin Ahmed, A Social History Of Bengal, Dhaka, 1970, P: 56.

১৭। বি.ডি. হাবিবুল্লাহ, শেরে বাংলা, ঢাকা, ১৯৬২, পৃঃ ১১১।

১৮। Azad, 9 January 1942 (Editorial)

১৯। See 'Appendix VIII: Fazlul Huq's move for a new progressive all India Muslim League' in Zaidi(eyd), Jinnah-Ispahani Correspondence, P: 166.

২০। Formation of New Government, part 1, P: 15.

২১। Kamruddin Ahmed, op. cit., P: 58.

২২। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬০।

২৩। Shila Sen, Muslim Politics in Bengal (1937-1947), Impex India, New Delhi, P: 151.

২৪। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১০।

২৫। Fazlul Huq to Herbert, 9 February 1943.

২৬। Kamruddin Ahmed, op. cit., P: 59.

২৭। Governor of Bengal to Secretary of State for India, Telegram, 28 March 1943.

২৮। Star of India, 24 April 1943, P: 4.

২৯। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬২।

৩০। হারুন-অর-রশিদ, "বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪৭)" দ্রষ্টব্য, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯৮।

৩১। M.A.H. Ispahani, Quid-E-Azam Jinnah as I know him, Karachi, 1966, P: 190.

৩২। এনায়েতুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫১।

৩৩। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৩।

৩৪। এ.এস.এম. আব্দুর রব, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ২৭।

৩৫। Jamil Uddin Ahmed (ed), The final phase of the struggle for Pakistan, Publishers United Ltd., Lahore, 1975, P: 306.

৩৬। এ.এস.এম. আব্দুর রব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮।

৩৭। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১২।

৩৮। Star of India, 10 April 1944, P: 4.

৩৯। Kamrunddin Ahmed, op. cit., P: 64.

৪০। Ram Gopal, Indian Muslims: A political History (1858-1947), Bombay, Reprinted, 1964, P: 278.

৪১। Abul Hashim (1905-1974) was the son of Abul Kashem a prominent Congressite Muslim of Burdwan district bar. In the 1937 assembly elections, he was elected as an independent candidate. The same year he joined the Muslim League in the hope that it would be 'abroad based democratic and progressive party.' Apart from being the president of the Burdwan Muslim League, Hashim was a councilor of the AIML and the BPML from 1939 onwards. In 1942, he was a councellor of the AIML and the BPML from 1939 onwards. In 1942, he was elected a member of the working committee of the Bengal Muslim League. In late 1943, he was elected as secretary of the Bengal Provincial Muslim League (BPML). See about Hashim, in Retrospection, Dhaka, 1974, P:1-18.

৪২। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২১২।

৪৩। Kamruddin Ahmed, op. cit., P: 64.

৪৪। Jamil-Ud-Din Ahmed, op. cit., P: 175.

৪৫। I.H. Qurashi, Struggle for Pakistan; History of the Freedom Movement, 3rd part, 1962, P: 228.

৪৬। M.H.H. Ispahani, op. cit., P: 143.

৪৭। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 156.

৪৮। Ispahani to Jinnah, 13 July 1945, Z.H. Zaidi, Jinnah-Ispahani Correspondence, 1936-1948, Karachi, 1976, P: 168.

৪৯। Kamruddin Ahmed, op. cit., P: 69.

৫০। M.A.H. Ispahani, op. cit., P: 139.

৫১। Ibid., P: 140.

৫২। এ.এস.এম. আব্দুর রব, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৭।

৫৩। Kamruddin Ahmed, op. cit., P: 73.

৫৪। এ.এস.এম. আব্দুর রব, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৮।

৫৫। Jamil-Ud-Din Ahmed, op. cit., P: 272.

৫৬। এস.এম রেজাউল করিম রেজা, "১৯৪৬ সালের নির্বাচন; পূর্ববাংলার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি" বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ২৭-২৮, ১৪০৯-১১, ২০০৫, পৃ: ৪।

৫৭। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩১।

৫৮। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 214.

৫৯। M.A.H. Ispahani, op. cit., P: 143.

৬০। Harun-or-Rashid, op. cit., P: 215.

৬১। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩২।

৬২। The statesman, 24 April, 1946 (Cutting), also Star of India, 24 April, 1946.

৬৩। Harun-or-Rashid, op. cit., P:227.

৬৪। Burrows to Lord Wavell, 25 April, 1946.

৬৫। Millat, 26 April, 1946, P: 2 (editorial).

৬৬। সিরাজউদ্দিন আহমদ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ঢাকা, ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃঃ ১১৯।

৬৭। Joya Chatterji, Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition (1932-1947), Cambridge, Cambridge University Press, 1994, P: 239.

৬৮। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৬।

৬৯। I.H. Qurashi, op. cit., P: 170.

৭০। Muslim League resolutions, August 1942.

৭১। Ram Gopal, Indian Muslim; A Political History (1858-1947), London, 1859, P: 304.

৭২। Jamil-Uddin, op. cit., P: 190.

৭৩। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৫।

৭৪। I.H. Qurashi, op. cit., P: 248-49.

৭৫। Star of India, 5 April, 1946, P: 1.

৭৬। S. Pirzada, Foundations of Pakistan: All India Muslims League Documents, 1906-1947, Vol: 11, Karachi, 1970, P: 510.

৭৭। Chaudhury Khaliquzzaman, op.cit., P: 340.

৭৮। Jamil Uddin, op. cit., P: 284.

৭৯। Abul Hashim, op. cit., P: 109.

৮০। Ibid.

৮১। M.A.H. Ispahani, op. cit., P: 159.

৮২। Ibid.

৮৩। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩৪।

৮৪। G. allana, Pakistan Movement: Historical document, Paradise Subscription Agency, Karachi, 1968, P: 299.

৮৫। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩৭।

৮৬। I.H. Qurashi, op. cit., P: 250.

৮৭। Ian Stephens, Pakistan, London, Earnest Benn Limited, 1967, P: 119.

৮৮। The resolutions of the working committee in star India 16 August, 1946, P: 1.

৮৯। Star of India, 15 August, 1946, P: 6.

৯০। M.A.H Ispahani, op. cit., P: 230.

৯১। Stephens, op. cit., P: 120.

৯২। V.P. Menon, The Transfer of Power in India, New Delhi, 1979, P: 256.

৯৩। Stephens, op. cit., P: 127.

৯৪। M.A.H. Ispahani, op. cit., P: 233.

৯৫। Stephens, op. cit., P: 129.

৯৬। P.Moon, Wavell, The Viceroy's Journal, London, 1973, P: 359; also, Star of India, 16 October, 1946, P: 3.

৯৭। I.H. Qurashi, op. cit., P: 291.

৯৮। Abul Kalam Azad, India wins freedom, Calcutta, Orient Langmans, 1959, P: 183.

৯৯। A.C. Johnson, Mission with Mountbatten, London, 1951, P: 46.

১০০। Stephens, op. cit., P: 194.

১০১। A.C Johnson, op. cit., P: 70.

১০২। Stephens, op. cit., P: 195.

১০৩। A.C Johnson, op. cit., P: 89.

১০৪। The statesman, 5 June 1947, P: 1.

১০৫। Stephens, op. cit., P: 201.

১০৬। A.C Johnson, op. cit., P: 89.

১০৭। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৭-২৪৮।

১০৮। I.H. Qurashi, op. cit., P: 250.

১০৯। Stephens, op. cit., P: 194.

১১০। Star of India, 11 March 1947, P: 2.

১১১। Statesman, 12 March 1947, P: 5.

১১২। Nicholas Mansergh and Perderal Moon, The transfer of power(1942-47), Vol: X, The Mountbatten Viceroyalty, London 1981, P: 897.

১১৩। Abul Kalam Azad, op. cit., P: 158.

১১৪। Harun or-Rashid, op. cit., P: 259.

১১৫। Star of India, 4 April, 1947, P: 2.

১১৬। Star of India, 15 March 1947, p: 6; also Sarat Chandra Bose, I warned My Countrymen, Calctta, Netaji Research Barcau 1968, p: 181. It must be remembered that on 6 January 1947 Sarat Bose resigned from the working Committee of the

AICC because of his differences with other members of the Congress High Command on Policy matters. See his telegraphic message of resignation. Ibid., P: 173-74.

১১৭। Statesman, 21 April 1947, P: 3.

১১৮। এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৫।

১১৯। Azad (editorials) 16 March 1947.

১২০। Akhil Dutta to Sardar Patel, 27 February 1947, Sardar Patel's Correspondence (1945-50), Ahmedabad, Navajivan Publishing House, 1972, P: 30.

১২১। Morning News, 17 March 1947.

১২২। অমৃত বাজার পত্রিকা, ৫ এপ্রিল ১৯৪৭।

১২৩। Suhrawardy's 27 April Statement, Star of India, 27 April 1947, P: 2.

১২৪। Ibid.

১২৫। Statesman, 15 May 1947.

১২৬। Morning News, (editorial) 16 May 1947.

১২৭। Suhrawardy's 27 April Statement.

১২৮। Abul Hashim's Press Statement on 1 May 1947, Millat (Weekly), 2 May 1947, Azad, 1 May 1947.

১২৯। The Statesman, 3 May 1947.

১৩০। The Morning News, 4 May 1947.

১৩১। Millat, 20 May 1947, The Statesman 23 May 1947, The Hindu, 24 May 1947.

১৩২। Sarat Chandra Bose to Gandhi, 23 May 1947, Abul Hashim, In Retrospection, P: 152.

১৩৩। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৯।

১৩৪। Harun or Rashid, op. cit., P: 194.

১৩৫। Sarat Chandra Bose Statement in Star of India, 3 June 1947, P: 2.

১৩৬। Gandhi to Sarat Bose, 8 June, Quoted in Abul Hasim, op. cit., P: 158.

১৩৭। Ibid.

১৩৮। The Statesman, 8 June 1947, Also I Warned my Countrymen: Being The Collected Works (1945-50) of Sarat Bose, Compiled by Netaji Research Bureau, Calcutta, 19868, P: 193.

১৩৯। Star of India, 20 May, P: 2. They met Jinnah on 18 May.

১৪০। Star of India, 29, May 1947, P: 1.

১৪১। Millat, 9 June 1947, P: 2.

১৪২। Kamruddin Ahmed, op. cit., P: 44.

১৪৩। সিরাজউদ্দিন আহমদ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ঢাকা, ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃঃ ১৪৭।

১৪৪। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৭।

১৪৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০১।

উপসংহার

১৯০৬ সালে পূর্ববাংলায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষ তথা বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়ে মুসলমানরা সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করে এবং স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তা প্রকাশের ও অধিকার আদায়ের জন্য একটি প্লাটফর্ম লাভ করে। এ সংগঠনটি মুসলিম রাজনীতির ধারা পাল্টে দিয়ে অবিরাম সংগ্রামের মাধ্যমে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করে। ফলে দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ১৯৪৭ সালে 'পাকিস্তান' নামে নতুন একটি মুসলিম রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে এবং পূর্ববাংলা নতুন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে পরিণত হয়। ১৯০৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং পূর্ববাংলার রাজনীতি ও মুসলমানদের সামগ্রিক উন্নয়নে সংগঠনটির ভূমিকা বিশ্লেষণ এ গবেষণা ও অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয়।

ভারতবর্ষের জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য নিয়ে ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন কারণে এতে মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে থাকে। মুসলমানরা যখন সকল ক্ষেত্রে অবহেলিত ও বঞ্চিত হতে থাকে তখন তাঁরা দাবি আদায়ের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক সুবিধার্থে 'বঙ্গভঙ্গ' এর মাধ্যমে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করলে পূর্ববাংলার মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায় এবং নতুন উদ্দীপনা নিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্রতী হয়।

এসময় বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র ভারত জুড়ে হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদ আন্দোলন ও মুসলিম বিদ্বেষের ঝড় শুরু হলে নবাব স্যার সলীমুল্লাহ সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম ঐক্যের

কথা চিন্তা করে একটি সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ গঠনের প্রস্তাব তুলে ধরেন। তাঁর প্রস্তাব নিয়ে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে এক মুসলিম প্রতিনিধি দল সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাত করেন এবং মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা দাবি করেন। এরপর ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে নবাব সলীমুল্লাহর প্রস্তাব অনুযায়ী সর্বসম্মতিক্রমে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ'(AIML) নামে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন জন্মলাভ করে। ১৯০৮ সালে নতুন প্রদেশ পূর্ববাংলা ও আসামের জন্য প্রথম মুসলিম লীগের শাখা স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয় এবং 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' (BPML) এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, ১৯০৯ সালে 'মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন' মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের এক মাইল ফলক ছিল। এ আইনে মুসলিম লীগের দাবি অনুযায়ী মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। ১৯১৩ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগদান করার পর হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দ্বার উন্মোচিত হয় এবং কংগ্রেসের সাথে নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এসময় স্বায়ত্তশাসন অর্জন মুসলিম লীগের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ১৯১৬ সালের 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' (Lucknow Pact) ছিল মুসলিম লীগের জন্য বড় সাফল্য। এ চুক্তির মাধ্যমেই কংগ্রেস প্রথম মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকার করে নেয় এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিও মেনে নেয়। এসময় থেকে মুসলিম লীগ মুসলমানদের দাবি-দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে সোচ্চার হয়। ১৯১৯ সালে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড' শাসনতান্ত্রিক সংস্কার পরিকল্পনায় বাংলার ন্যায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকায় মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। এছাড়া ১৯১৯ সালে মুসলিম লীগ তুরস্কের খিলাফতের অস্তিত্ব রক্ষায় ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জনকে অপরিহার্য বিবেচনা করে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে ভারতে দলটির অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধানে মুসলিম লীগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯২৩ সালে স্বরাজ দলের সাথে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পাদিত হলে এর শর্তাবলী বাংলার মুসলমান সমাজে ব্যাপক সমাদৃত হয়। এরপর মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সাথে যুক্ত শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে আলোচনা চালায়। এ উদ্দেশ্যে ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে 'দিল্লি প্রস্তাব' এবং ১৯২৮ সালের আগষ্টে 'নেহেরু কমিটি' গঠিত হলে মুসলিম লীগ মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণে তৎপর হয়ে ওঠে। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯২৯ সালে দিল্লিতে মুসলিম লীগ পরিষদের সভায় মুহম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক রচিত ১৪ দফা দাবি গৃহীত হয়।

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের দাবি ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ভারতের শাসন সংস্কারেও সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৮ সালে গঠিত সাইমন কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশিত শাসনতন্ত্রের সুপারিশ মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী হওয়ায় মুসলিম লীগ তা প্রত্যাখান করে। এরপর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের নিয়ে ১৯৩০-১৯৩২ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করলে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বৈঠকে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহন করেন ।

এরপর ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে 'ভারত শাসন আইন' প্রণয়ন করে যাতে নীতিগতভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করে নেয়া হয়। এ আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ অংশগ্রহণ করে। প্রাদেশিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এসময় বাংলায় মুসলিম লীগের পুনর্জাগরণ ঘটে। পূর্ববাংলায় ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টির মাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে, কলকাতায় অভিজাত মুসলিম নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়ে প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য 'ইউনাইটেড মুসলিম লীগ' গঠন

করেন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ দলে যোগদান করায় দলটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৯৩৬ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ লন্ডন থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে নির্জীব মুসলিম লীগকে পুনর্জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং লীগের নতুন গঠনতন্ত্র রচনা করেন। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন মুসলিম লীগের নির্বাচনী কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করায় বঙ্গীয় আইন পরিষদে ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'প্রজা-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা' গঠিত হয়। ফজলুল হকের প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা পূর্ববাংলার মুসলমানদের উন্নয়নে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

এসময় মুসলিম লীগ ও বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক প্রসিদ্ধ ঘটনা ছিল ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লীগের ২৭ তম অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন। এ প্রস্তাবে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবি করা হয়। লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলিম লীগ গণমানুষের সংগঠনে পরিণত হয়। এসময় পূর্ববাংলাই ছিল ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে একমাত্র প্রদেশ যেখানে মুসলিম লীগের প্রাধান্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দীর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এসময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ পুনর্গঠিত হয় এবং অন্যান্য প্রদেশের অনুপ্রেরণার উৎসস্থলে পরিণত হয়।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৩৭-১৯৪০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যে দলগত মূলনীতি ছিল এক ও অভিন্ন। কিন্তু ১৯৪০ সালের পর থেকে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও ফজলুল হকের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ দ্বন্দ্বের সূত্র ধরেই ১৯৪১ সালে ফজলুল হক ও তাঁর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ।

আইনসভায় ফজলুল হকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় গভর্নর তাঁকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের আহবান জানালে ১৯৪১ সালে তিনি ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা' বা 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা' গঠন করেন। কিন্তু এ পর্যায়ে মুসলিম লীগ বাংলায় এতটাই জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত হয় যে, বাংলার শ্রেষ্ঠ অবিসংবাদিত নেতা 'শের-ই-বাংলা' সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই প্রথম জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালে তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভা অসাংবিধানিকভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এরপর গভর্নর মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা খাজা নাযিমুদ্দীনকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহবান জানালে ১৯৪৩ সালে তিনি ১৩ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু 'নাযিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা'র দুর্ভাগ্য যে, প্রদেশের প্রশাসনিক কাজ শুরু করার পূর্বেই বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (পঞ্চাশের মন্বন্তর) হয়। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ নাযিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং গভর্নর আর.জি. কেসী প্রদেশে 'গভর্নরের শাসন' প্রচলন করেন। এরপর ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় পরিষদ ও ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বাংলা সহ ভারতের সকল প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিযোগীতা করে। কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে ৩০টি মুসলমান আসনের সবগুলো মুসলিম লীগ দখল করে।

এসময় আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী দলে পরিণত হয়। ফলে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বঙ্গীয় আইন পরিষদের ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ সর্বোচ্চ ১১৪টি আসন লাভ করে। ১৯৪৬ সালের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে দুটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়, (১) মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় ও ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং (২) মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন রয়েছে।

নির্বাচনের পরপরই এইচ.এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী সর্বসম্মতিক্রমে লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। এপ্রিলে বাংলার নতুন গভর্নর ফ্রেডারিক বারোজ সোহরাওয়ার্দীকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহবান জানালে তিনি ১৩ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ভারতে এটিই ছিল একমাত্র মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার কার্যকাল ছিল বাংলার ইতিহাসের ব্যাপক ঘটনাবহুল এবং তাৎপর্যপূর্ণ সময়। কারণ নির্বাচনের পূর্বে ও পরে ভারতের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে সর্বভারতীয় পর্যায়ে এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয় যাতে বাংলার রাজনীতিও দ্রুত গতিতে আবর্তিত হতে থাকে।

মূলত, লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকেই ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে মুসলিম নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। মুসলিম লীগ অখন্ড ভারতের পরিকল্পনা থেকে সরে গিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ দাবি করে। যেহেতু কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকার অখন্ড ভারতের পক্ষে ছিল, তাই মুসলিম লীগকে পাকিস্তান দাবি আদায়ের পথে এ দুই বিরুদ্ধ শক্তির সাথে সংগ্রাম করতে হয়। এসময় ব্রিটিশ সরকার ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার বিষয়ে ভারতীয় নেতাদের সহযোগীতা লাভের জন্য পর্যায়ক্রমে কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। কিন্তু ১৯৪০ সালের ‘আগষ্ট’ প্রস্তাব, ১৯৪২ সালের ‘ক্রীপস প্রস্তাব’, ১৯৪৫ সালের ‘ওয়াভেল পরিকল্পনা’ এবং সর্বোপরি ১৯৪৬ সালের ‘মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা’ও মুসলিম লীগ কিংবা কংগ্রেসের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

ইতোমধ্যে, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ভারত ছাড় আন্দোলন ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হতে থাকে। এ পর্যায়ে মুসলিম লীগ মুসলমানদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকার মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী গণপরিষদ গঠনের মাধ্যমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে। এতদসত্ত্বেও,

মুসলিম লীগ পরিষদের বৈঠকে ব্রিটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য মুসলমানদের সরকারী উপাধি বর্জন ও প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ভয়ঙ্কর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলে এবং ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা প্রদান করলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে। যদিও এসময় মুসলমান নেতারা ভারতের সর্বত্র কালো পতাকা উত্তোলন ও 'কৃষ্ণ দিবস' পালন করে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে তবে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে সার্বিক দিক বিবেচনা করে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ অক্টোবর মাসে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করেন।

ভারতের প্রশাসনিক সমস্যা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় সার্বিক দিক বিবেচনা করে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের সাথে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যত দ্রুত সম্ভব ভারত বিভাগ ছাড়া হিন্দু-মুসলিম বিরোধ মীমাংসার অন্য কোন পথ নেই। এরূপ পরিস্থিতিতে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের শর্ত দিয়ে ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত হন। কিন্তু মুসলিম লীগ যে কোন মূল্যে পাকিস্তান দাবি আদায়ের সিদ্ধান্তে অনমনীয় অবস্থানে থাকে।

এসময় শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশংকর রায়, এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম সহ কয়েকজন নেতা বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করেন। তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, পূর্ববাংলা পাকিস্তান বা হিন্দুস্তান কোন রাষ্ট্রেই যোগদান করবে না; এটি হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালের ২০ মে 'অখন্ড স্বাধীন বাংলা' রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ও শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা 'সোহরাওয়ার্দী-বসু-রায় চুক্তি' নামে পরিচিত। স্বাক্ষরিত চুক্তির কপি কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হলে উভয় কর্তৃপক্ষ এ চুক্তি প্রত্যাখান করায় ভারত বিভাগের সাথে বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যায়।

১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাশ হয় এবং ১৪ আগস্ট 'পাকিস্তান' নামে নতুন মুসলিম রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে।

সার্বিক আলোচনা বিশ্লেষন করে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলা তথা সর্বভারতীয় মুসলমানদের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল মুসলিম লীগের প্রথম সাফল্য। লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং বেঙ্গল প্যাক্টে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম লীগ ভারতের শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং লাহোর প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগ পূর্ববাংলায় গণমানুষের সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। এরপর ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমান হয় যে, মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সর্বোপরি মুসলিম জাতিসত্তার জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবিতে মুসলিম লীগ ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে অবশেষে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯০৬-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার রাজনীতিতে এবং মুসলমানদের ভাগ্য উন্নয়নে মুসলিম লীগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আলোচ্য সময়ে মুসলিম লীগ পূর্ববাংলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রন করে এবং বাংলায় মুসলমানদের অবস্থান সুরক্ষিত করে সামগ্রিক উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা পালন করে। মুসলমানদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ প্রথমে কংগ্রেসের সাথে সমঝোতা স্থাপন করে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয় এবং পর্যায়ক্রমে দাবি দাওয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট উপস্থাপনের মাধ্যমে আইনসভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে। মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিতে মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের মত শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সাথে আপোষ না করে সংগ্রামের মাধ্যমে অবশেষে সফলতা অর্জন করে। একথা অনস্বীকার্য যে, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত না হলে ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা এবং পৃথক আবাসভূমি স্থাপন দুরাশায় পরিণত হত। মূলত, মুসলিম

লীগের আপোষহীন রাজনীতির অভিজ্ঞতায় বাংলার জনগণ সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের শক্তি ও সাহস অর্জন করে এবং পরবর্তীতে আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলায় স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

পরিশিষ্ট-১

জীবনপঞ্জী

নবাব স্যার সলীমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

নবাব সলীমুল্লাহ ১৮৭১ সালে ঢাকার নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ। তাঁর পিতার নাম নবাব আহসান উল্লাহ। ১৮৯৩ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন। ১৯০২ সালে তাঁর বংশানুক্রমিক 'নবাব বাহাদুর' খেতাব ধারণ করেন। ১৯০৩ সালে কে.সি.আই.ই. উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার 'বঙ্গভঙ্গ' এর মাধ্যমে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে নতুন প্রদেশ গঠন করলে তিনি বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানিয়ে নবগঠিত প্রদেশের মুসলমানদের ভাগ্য উন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এ লক্ষ্যে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ঢাকার নর্থব্রুক হলে আনুষ্ঠানিকভাবে 'প্রাদেশিক মুসলিম সংঘ' গঠন করেন এবং এর পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হন। এরপর থেকে পূর্ববাংলার জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেন এবং জনপ্রিয় নেতার আসন লাভ করেন। ১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর প্রচেষ্টায় নতুন রাজধানী ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম শিক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব প্রতিহত করতে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম ঐক্যের কথা চিন্তা করেন এবং মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকায় 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯০৭ সালে তাঁর উদ্যোগে

কলকাতায় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' গঠিত হলে তিনি এর সভাপতি মনোনীত হন। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষিত হলে তাঁর প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। ১৯১৩ সালের পর প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালের ১২ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

শের-ই-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)

শের-ই-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৮৭৩ সালের ১৬ অক্টোবর বরিশালের চাখারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় স্নাতক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে এম.এ.(১৮৯৫); আইন কলেজ থেকে বি.এল. (১৮৯৭)। কিছুকাল কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শিক্ষানবিশি করার পর ১৯০১ থেকে বরিশাল আদালতে আইন ব্যবসা শুরু এবং রাজেন্দ্র কলেজে গণিতে অধ্যাপনা। ১৯০৬-১২ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি গ্রহণ। ১৯১২ কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান। ১৯১২-তে রাজনীতি শুরু। ১৯১৩-১৫ ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য। ১৯১৩ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক (১৯১৩-১৬)। ১৯১৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ও ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

১৯১৮ ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। ১৯২৪ অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত এবং কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা। ১৯৩৭-৪৭ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য, ১৯৩৭-৪১ মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী। ১৯৩৭-এ মুসলিম লীগে যোগদান করে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে যোগদান এবং বঙ্গীয় মুসলিম

লীগের সভাপতির পদ লাভ। এই অধিবেশনে তিনি শের-ই-বাংলা উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৪১ এ জিন্নাহর সঙ্গে মতবিরোধের কারণে মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন এবং কংগ্রেস, হিন্দুসভা ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন করে দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভা গঠন করেন যা ইতিহাসে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা নামে খ্যাত।

২৭ জুলাই ১৯৫৩ মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করে কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠন এবং এর সভাপতি নিযুক্ত। ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের আওয়ামী মুসলিম লীগ ও নিজামে এছলামী দলের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রি নির্বাচিত (৩.৪.৫৪-২৯.৫.৫৪)। ১৯৫৫-৫৮ কেন্দ্রীয় আইনসভারও সদস্য। ১১ আগস্ট ১৯৫৫ কেন্দ্রে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি নির্বাচিত। ২৫.৩.১৯৫৬-৩১.৩.১৯৫৮ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। মৃত্যু, ঢাকা, ২৭.৪.১৯৬২।

মুহম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮)

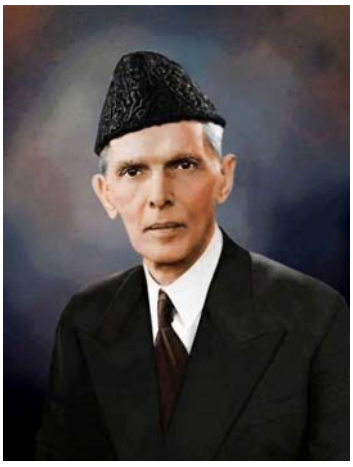

মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৮৭৬ সালে করাচীতে জন্মগ্রহণ করেন। দাদাভাই নওরোজি এবং জিকে গোখলের অনুপ্রেরণায় ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতি শুরু করেন ১৯০৫ সালে। লন্ডনে পড়াশোনা শেষ করে ১৮৯৬ সালে ওকালতি শুরু করেন। ১৯১৩ সালের মুসলিম লীগে যোগদান করলেও ১৯২০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের সদস্যপদ বহাল রাখেন। ১৯১৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ছিলেন। মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৩০ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠক শেষে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত লন্ডনেই অবস্থান করেন। ঐ বছর ভারতে ফিরে এসে মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত

হন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪০ সাল থেকে পাকিস্তান আন্দোলন শুরু করেন। দেশ বিভাগের পর স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ মৃত্যুবরণ করেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯৩-১৯৬৩)

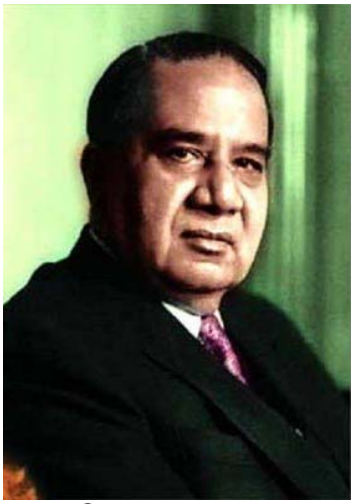

পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুরে জন্ম । কলকাতা, অক্সফোর্ড এবং লন্ডনে পড়াশোনা শেষে কলকাতায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। প্রথম জীবনে কলকাতায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাস যখন কলকাতার মেয়র তিনি তখন ডেপুটি মেয়র ছিলেন। ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক কাউন্সিলের সদস্য হন। ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন। ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় (১৯৩৭-৪১) এবং খাজা নাযিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভায় (১৯৪৩-৪৫) মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত অখণ্ড বাংলার মুখ্যমন্ত্রি ছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু দেশভাগের পরেও ভারতীয় নাগরিকত্ব বহাল রাখায় ১৯৪৮ সালে গণপরিষদের সদস্যপদ হারান। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানে আসেন এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে ভূমিকা রাখেন।

১৯৫৪ সালে গঠিত যুক্তফ্রন্ট-এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রি হন (Ministry of Talents -এর)। ১৯৫৫ সালে গণপরিষদের সদস্য এবং ১৯৫৬ সালে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। সামরিক আইনের আওতায় ১৯৬২ সালের সংবিধান জারির পূর্বমুহূর্তে (৩০-১-৬২) আইয়ুব সরকার তাঁকে বন্দি করেন। বিশদিন পর মুক্তি লাভ করেন। দেশ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তাঁকে গণতন্ত্রের অতন্দ্রপ্রহরী বলা হয়ে থাকে।

খাজা নাযিমুদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪)

১৮৯৪ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার নওয়াব পরিবারের সন্তান। আলীগড়, লন্ডন এবং কেমব্রিজে পড়াশোনা করেন। ১৯২২ রাজনীতিতে প্রবেশ। ১৯২২-২৯ সময়কালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সময়ে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি।

বঙ্গীয় আইন পরিষদে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির (তখন বিরোধীদল) নেতৃত্ব দেন। নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। দেশভাগের পর ১৯৪৭ সালে পূর্ববাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রি (১৯৪৭-৪৮) নিযুক্ত হন। তারপর প্রধানমন্ত্রি (১৯৫১-৫৩)। পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনে তিনি বিতর্কিত ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৩ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক পদচ্যুত হওয়ার পর ১৯৬২ সাল পর্যন্ত রাজনীতি থেকে বিরত থাকেন। ১৯৬২ সালে নবগঠিত কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৬৪) ঐ পদে আসীন ছিলেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন করেন। COP (Combined Opposition Party) গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল।

মোহাম্মদ আকরাম খান (১৮৬৮-১৯৬৮)

জন্ম, হাকিমপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিম বঙ্গ। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি ইসলামী সাহিত্যেও বুৎপত্তি অর্জন করেন। সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' (১৯১০), দৈনিক 'সেবক' (১৯২২), মাসিক 'মোহাম্মদী' (১৯২৭), দৈনিক 'আজাদ' প্রভৃতি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' ও এর মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র অন্যতম সংগঠক। 'আঞ্জুমান-ই-উলামা-ই-বাঙ্গালা'র প্রথম সভাপতি ও এর মুখপত্র 'আল-এসলাম' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। বাংলায় খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। সক্রিয়ভাবে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কারাবরণ। চিত্ত রঞ্জন দাসের বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস ত্যাগ। ফজলুল হক ও অন্যান্যদের সঙ্গে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন। ১৯৩৬ সালে দৈনিক আজাদ প্রকাশ ও সম্পাদনা। একই বছর মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত। পরবর্তীতে পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৪ সালে রাজনীতি থেকে অবসর। মৃত্যু, ঢাকা, ১৮.৮.১৯৬৮।

আব্দুর রসুল (১৮৭২-১৯১৭)

জন্ম, গুনিয়াক গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পিতা গোলাম রসুল একজন সমৃদ্ধশালী জমিদার। ১৮৮৮ সালে ঢাকার কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিলাত গমন। ১৮৯২ সালে লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে প্রবেশিকা, ১৮৯৬ সালে অক্সফোর্ডের সেন্ট জোন্স কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৯৮ সালে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ঐ একই বছর বি.সি.এল.(Bachelor of Civil Law) ডিগ্রী লাভ এবং মিডল টেম্পল থেকে বার-এট-ল পরীক্ষায় কৃতকার্য। ১৮৯৯ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের সংগঠিত করার জন্য ১৯০৬ সালের ৩রা নভেম্বর 'বেঙ্গল মহামেডান এসোসিয়েশন গঠন ও এর সভাপতি। একই বছর ৩১ শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগের বিকল্প সংগঠনরূপে 'ইন্ডিয়ান মুসলমান এসোসিয়েশন গঠন ও এর অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতি (১৯০৬ সালের বরিশাল অধিবেশনে প্রথমবার ও ১৯১২ সালে চট্টগ্রাম অধিবেশনে দ্বিতীয়বার)। ১৯০৬ সালে 'দি মুসলমান' নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত। ১৯০৭ সালে মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। এবং ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তির অন্যতম স্থপতি। ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। একই বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্বাচিত। মৃত্যু, কলকাতা, ৩০.৮.১৯১৭।

পরিশিষ্ট-২

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সম্পর্কিত দলিল

"A new province will be created with the status of a Lieutenant Governorship, consisting of the Chittagong, Dacca and Rajshahi Divisions of Bengal, the district of Malda, the State of Hill Tipperah, and the present Chief Commissionership of Assam. Darjeeling will remain with Bengal. In order to maintain associations which are highly valued in both areas, the province will be entitled Eastern Bengal and Assam. Its Capital will be at Dacca with subsidiary headquarters at Chittagong. It will comprise an area of 106,540 square miles and a population of 31 millions, of whom 18 millions are Mohammadans and 12 millions Hindus. It will possess a Legislative Council and a Board of Revenue of two members and the Jurisdiction of the High Court of Calcultta is left undisturbed. The existing province of Bengal diminished by the surrender of these large territories on the east and of the five Hindu States of Chhota Nagpur but increased by the acquisition of Sambalpur and the five Uriya States before mentioned, will consist of 141,580 square miles with a population of 54 millions of whom 42 million are Hindus and 9 millions Mohammadans. In short the territories now composing Bengal and Assam will be divided into two compact, and self-contained provinces, by far the largest constituents of each of which will be homogeneous in character, and which will possess clearly defined boundaries and be equipped with the complete resources of an advanced administration."

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ ১ম খন্ড (ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২) পৃঃ ১

পরিশিষ্ট-৩

১৯০৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের সভাপতিদের নামের তালিকা

Name of President	**Year**
Adamjee Pirbhoy	1907
Sir Ali Imam	1908
Sir Aga Khan	1909
Nabiullah	1910
Nawab Salimullah	1912
Sir Muhammad Shafi	1913
Mazhar-ul-Haq	1915
M.A. Jinnah	1916
Maulana Muhammad Ali	1917
A.K. Fazlul haque	1918
Hakim Ajmal Khan	1919
Dr. M.A. Ansar	1920
Maulana Hazrat Mohani	1921
Ghulam Muhammad Bhurgin	1923
M.A. Jinnah	1924
Sir Abdul Rahim	1925
Sir Abdul Qadir	1926
Sir Muhmmad Yaqub	1927
M.A. Jinnah	1929
Sir Muhammad lqbal	1930
Sir Zafrullah Khan	1931
K.B. Hafiz Hidayat Hussain	1933
M.A. Jinnah	1934
Sir Wazir Hasan	1936
M.A. Jinnah	1937-47

পরিশিষ্ট-৪

মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব - ১৯৪০

While approving and endorsing the action taken by the Council and the Working Committee of the All India Muslim League, as indicated in their resolutions dated the 27th of August, 17th and 18th of September and 22nd of October 1939, and 3rd of February 1940 on the constitutional issue, this Session of the All India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of federation embodied in the Government of India Act, 1935, is totally unsuited to, and unworkable in the peculiar conditions of this country and is altogether unacceptable to Muslim India.

It further records its emphatic view that while the declaration dated the 18th of October 1939 made by the Viceroy on behalf of His Majesty's Government is reassuring in so far as it declares that the policy and plan on which the Government of India Act, 1935, is based will be reconsidered in consultation with the various parties, interests and communities in India, Muslim India will not be satisfied unless the whole constitution plan is reconsidered de novo and that no revised plan would be acceptable to the Muslims unless it is framed with their approval and consent.

Resolved that it is the considered view of this Session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless this is designed on the following basic principles, viz., that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as

may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute “Independent States” in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in these units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them; and in other parts of India where the Mussalmans are in a minority adequate, effective and mandatory safeguards shall be specifically provided in the constitution of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

This Session further authorises the Working Committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective regions of all powers such as defence, external affairs, communications, customs and such other matters as may be necessary."

Source: Syed Sharifuddin Pirzada (ed.), Foundations of Pakistan, Vol. II, P. 341.

পরিশিষ্ট-৫

মানচিত্র-১: বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫-১৯১১

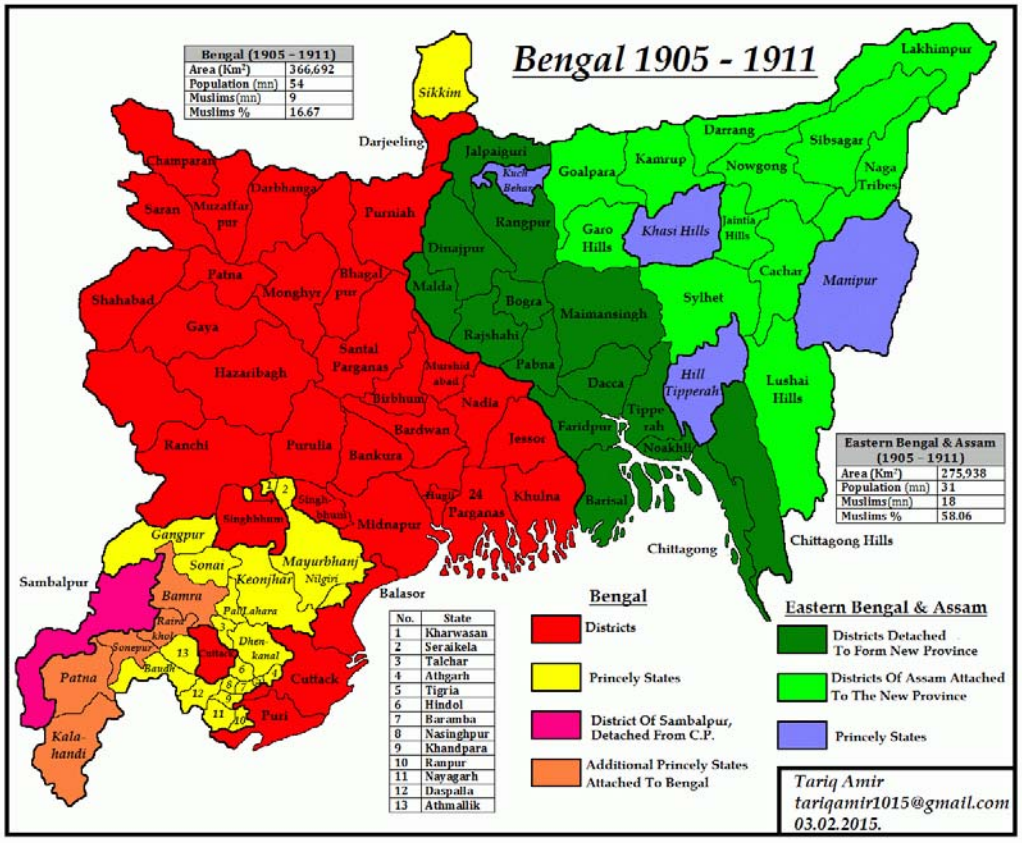

Source: http://pakgeotagging.blogspot.com/2015/02/partitions-of-bengal-in-1905-and-1947.html

মানচিত্র-২: বাংলা বিভাগ - পূর্ব ও পশ্চিম, ১৯৪৭

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Bengal_Presidency

মানচিত্র-৩: পাকিস্তান রাষ্ট্র, ১৯৪৭

Source:https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/asiapacific-region/pakistanbangladesh-1947-1971/

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরেজী গ্রন্থ

Ahmed, Jamil Uddin (ed) : The final phase of the struggle for Pakistan, Publishers United Ltd., Lahore, 1975.

Ahmed, Kamruddin : A Social History Of Bengal, Dhaka, 1970.

Ahmed, Rafiuddin : The Bengal Muslims (1871-1906): A Quest for Identity, New Delhi, 1981.

Ahmed, Salahuddin : Social Ideas and Social Change in Bengal(1818-1835), E.J. Brill, Leiden, 1965.

Ahmed, Sufia : Muslim Community in Bengal (1885-1912], Dacca, 1974.

Allana, G. : Pakistan Movement: Historical document, Paradise Subscription Agency, Karachi, 1968.

Azad, Abul Kalam : India wins freedom, Calcutta, Orient Langmans, 1959.

Aziz, K.K. : Britain And Muslim India, London, 1963.

Basu, Mrinal kumar	:	Rift and Reunion: Contradictionsin the Congress (1908-1918), Calcutta, 1990.
Bhattasali, N.K.	:	Coins and Chronalogy of the Early Independent Sultans of Bengal, Dhaka, 1990.
Bose, Nemai sadhan	:	Indian Awakening and Bengal, Calcutta, Reprint, 1990.
Broomfield, J.H.	:	Elite conflict in a plural society: Twenteeth-Century Bengal, USA, University of California Press, 1968.
Chakravorti, K.M.	:	The National Council of Education, Bengal:A History and Homage, Calcutta, 1968.
Chand, Tara	:	History of Freedom Movement in India, Vol. III, New Delhi, 1920
Chatterji, Joya	:	Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition (1932-1947), Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
Chattopadhyay, Gautam	:	Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle (1862-1947), New Delhi, 1984.

Das, Ujjal Kanti : The Bengal Pact of 1923 and its Reactions; Bengal - Past and Present, vol. xcix, Part 1, 1980.

Dutta, C.R. : The Economic History of British India Under Early British Rule, Calcutta, 1969.

Gandhi, Rajmohan : Understanding The Muslim Mind, First Published in the U.S.A. by the State University of New York Press, Albany, 1986, Reprinted in India, by Ananda offset Private Limited, Calcutta, 1990.

Pansy Chaya : The Development of the Indian National Congress (1892-1909). First Edition, Calcutta, 1960.

Gopal, Ram : Indian Muslims : A political History (1858-1947), Bombay, Reprinted, 1964.

Gordon, Leonard A. : Bengal: The Nationalist Movement 1876-1940, New York, Colombia University Press, 1947.

Hyat, Abul : Mussalmans of Bengal, Calcutta, 1966.

Hamid, Abdul : Muslim Separatism in India, A Brief Survey, 1858, 1947, Oxford University Press, 1967.

Haque, Enamul : Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents, Samudra Prokashani, Dacca, 1968.

Hasan, Mushirul : Nationalism and Communal politics in India (1916-1928), New Delhi, 1979.

Hashmi, Taj-ul-Islam : Pakistan as a Peasant Utopia: The Communalization of Class Politics in East Bengal (1920-1947), Colorado, 1992.

Hill, S.C. : Bengal in 1956-1957, Vol-1, London, 1905.

Hunter, William Wilson : The Indian Musalmans, Bangladesh Edition, Dacca, 1975.

Hussain, M. Delwar : A study of Nineteenth Century Historical Works on Muslim Rule In Bengal: Charles Stewart To Henry Beveridge, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987.

Dhaka University Institutional Repository

Ikram, S.M	:	Modern Muslim India and The Birth of Pakistan, Second Edition, Revised and Enlarged, Lahore, 1965.
Ispahani, M.A.H.	:	Quaid-i-Azam Jinnah as I know him, Karachi, 1976.
Jain, Naresh Kumar (edited)	:	Muslims in India, vol. I & I, New Delhi, 1976.
Johnson, A.C.	:	Mission with Mountbatten, London, 1951.
Karim, A.K. Nazmul	:	The Dynamics of Bangladesh Society, Vikas , New Delhi, 1980.
Kabir, Humayun	:	Muslim Politics: 1906-1942, Calcutta, 1943.
Khaliquzzaman, Chowdhury	:	Pathway to Pakistan, Lahore, 1961.
Khan, Bazlur Rahman	:	Politics in Bengal (1927-1936), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987.
Lahiri, Pradip Kumar	:	Bengali Muslim Thought (1818-1947): Its Liberal and Rational Trends, Caleutta, 1991.

Maitra, Jayanti	:	Muslim Politics in Bengal (1855-1906): Collaboration and Confrontation, First Published, Calcutta, 1984.
Majumdar, Romesh Chandra (edited)	:	An Advanced History of Inida, London, 1965.
Majumdar, R.C.	:	The History of Bengal, Vol.1, Dacca University, 1943.
Majumdar, R. C.	:	History of the Freedom Movement in India, Vol:III, Calcutta, Firman KLM Pvt. Ltd., 1996.
Malleson, G.B.	:	The Decisive Baltle of India, London, 1894.
Malleson, G.B.	:	Lord Clive Rulers of India Series, Oxford, 1895.
Mallick, Azizur Rahman	:	British policy and the Muslims in Bengal (1757-1856), Asiatic Society of Pakistan, 1961.
Mallick, Azizur Rahman	:	The Muslims and the Partition of Bengal, Pakistan History Association, Karachi, 1905.

Dhaka University Institutional Repository

Mannan, Mohammad Siraj : The Muslim Political Parties in Bengal (1936-1947) : A study of Their Activities and struggle for Freedom, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1987.

Mansergh, Nicholas : The transfer of power(1942-47), Vol: X, The Mountbatten Viceroyalty, London 1981

Menon, V.P. : The Transfer of Power in India, New Delhi, 1979.

Minault, Gail : The Khilafat Movement: Religious Symbolism and Political Mobilization in India, Oxford University Press, Delhi, 1982.

Momen, Humaira : Muslim Politics in Bengal, Dacca, 1972.

Mukherji, Haridas and Uma : Indias Fight For Freedom or The Swadeshi Movement (1905-1906), Calcutta, 1958.

Noman, Mohammad : Muslim India, Allahbad Law Journal Press, Allahbad, 1942.

Nugent, Helen M. : Politics of Partition: Bengal 1932-1947, Ph.D. Thesis, University of Queensland, 1978.

Pirzada, Syed Sharifuddin : Foundations of Pakistan: All-India Muslim League Documents(1906-1947), vol. I, Karachi, 1969.

Qurashi, I. H. : Struggle for Pakistan; History of the Freedom Movement, 3rd part, Karachi,1962.

Rab, A.S.M. Abdur : A.K. Fazlul Haq: life and Achievements, Barisal, 1966.

Rahim, Muhammad Abdur : The History of the University of Dacca, University of Dacca, Dacca, 1981.

Rahim, Muhammad Abdur : The Muslim Society and Politics in Bengal (1757-1947), Dhaka, The University of Dhaka, 1978.

Rahman, Matiur : From Consultation To Confrontation: A Study of the Muslim League in British Indian Politics (1906-1912),London, 1970.

Rahman, M. Fazlur : The Bengali Muslims and English Education (1765-1835), Dacca, 1973.

Dhaka University Institutional Repository

Rashid, Harun-or- : The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim politics (1936-1947), Asiatic Society of Bangladesh, The University Press Limited, Dhaka, 1987.

Ray, Rajat Kanta : Social Conflict and Political Unrest in Bengal (1875-1927), Oxford University Press, Delhi, 1984.

Roberts, P.E. : History of British India: Under the Company and the Crown, London, Reprinted, 1958.

Roy, Asim : The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal, Copyright, 1983, by Princeton University Press, Reprinted by Permission by Princeton University Press by Academic Publishers, Dhaka.

Sarkar, Chandiprasad : The Bengali Muslims : A Study in their Politicization (1912-1929), Calcutta, 1991.

Sarkar,Sumit : The Swadeshi Movement in Bengal (1903-1908), Second Reprint, New Delhi, 1994.

Dhaka University Institutional Repository

Seal, Anil : The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the later Nineteenth Century, Cambridge, 1968.

Sen, Shila : Muslim Politics in Bengal (1937-1947), Impex India, New Delhi, 1976.

Smith, Wilfred Cantwell : Modern Islam in India : A social Analysis, Reprinted, New Deihi, 1979.

Stephens, Ian : Pakistan, London, Earnest Benn Limited, 1967.

Tarafder, M.R. : Hussain Shahi Bengal, Dhaka, 1991.

বাংলা গ্রন্থ

আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮), তৃতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৩।

আহমদ, সিরাজউদ্দিন : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ঢাকা, ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৬।

 Dhaka University Institutional Repository

আলী, এ. কে. এম. ইদ্রিস : উসমানীয় খিলাফত ও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বত্রিশ বর্ষ, ১ম - ৩য় সংখ্যা, ১৪০৫।

আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ : বাঙলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬।

আলী, সৈয়দ মুর্তাজা : মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬।

আহমদ, আবুল মনসুর : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ১৯৭৫।

আলী, সৈয়দ মকসুদ : রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।

আলী, আমীর : মেময়রস, ইসলামিক কালচার, ৫ম খন্ড, ১৯৩১

ইসলাম, সিরাজুল : বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, তৃতীয় সংস্করন, ১৯৮৭।

ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল : বঙ্গীয় আইন সভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) : বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), প্রথম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

ইসলাম, সিরাজুল : বাংলার ইতিহাস:ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ঢাকা, ১৯৮৪।

উমর, বদরুদ্দীন : ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

উমর, বদরুদ্দীন : ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০।

ওয়ালীউল্লাহ, মুহাম্মদ : আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮।

করিম, আব্দুল : বঙ্গ : বাঙ্গালা : বাংলাদেশ, মানববিদ্যা বক্তৃতা, ঢাকা, ১৯৮৭

কামাল, মেসবাহ ও অন্যান্য (সম্পা.) : আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭।

খালেক, এ. : এক শতাব্দী, ঢাকা, ১৯৮৫।

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্র মোহন : বাঙ্গালীর রাষ্ট্র চিন্তা (প্রথম খন্ড), কলকাতা, ১৯৯১।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার : বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৭৬।

চৌধুরী, আবদুল মুমিন : বঙ্গ, বাংলাপিডিয়া, খন্ড ৮, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা) ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১১ (২য় সংস্করন)।

দেশাই, এ. আর. : ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, ভাষান্তর মনস্বিতা সান্যাল, কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম অনুবাদ সংস্করন, ১৯৮৭।

দে, অমলেন্দু : পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭২।

নাথ, বিপুলরঞ্জন : ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ও রাজনীতি, ঢাকা, বুক সোসাইটি, ২০০৩।

ঊন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ কুমার : বাঙলা ও বাঙালী, পাটনা, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল দাস : বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খন্ড, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭১।

বন্দোপাধ্যায়, শেখর : পলাশী থেকে পার্টিশান; আধুনিক ভারতের ইতিহাস, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৬।

মান্নান, কাজী আবদুল : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৯।

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর : গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

রহমান, এ এইচ.এম. মাহবুবুর : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

রহিম, মুহম্মদ আব্দুর ও অন্যান্য (সম্পা) : বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, নতুন সংস্করন, ২০০৬।

রহিম, আব্দুর ও অন্যান্য (4 Doctors) : বাংলাদেশের ইতিহাস, নবম সংস্করন, ২০০১।

রসুল, মোহাম্মদ গোলাম : বাংলাদেশ ও পাক ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড, ১৯৯২।

রশীদ, হারুন-অর- : বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষঃ পিছন ফিরে দেখা, ইতিহাস, উনচল্লিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ২০০৬।

রায়, সুপ্রকাশ : ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭০, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯০।

রব, এ.এস.এম আব্দুর : শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ঢাকা, ১৯৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

রহিম, এম. এ. : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), চতুর্থ প্রকাশ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৪।

রহিম, এনায়েতুর : বাংলার স্ব-শাসন (১৯৩৭-১৯৪৩), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১।

সাঈদ, এম.এ. : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, ঢাকা,২০১৪।

সুর, অুল : বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৪।

হক, মোঃ মোজাম্মেল : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, শুভেচ্ছা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ঢাকা-২০১৫।

হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল- : ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩।

হোসেন, ইমরান : বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী চিন্তা ও কর্ম (১৯০৫-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩।

হোসেন, আবু মো: দেলোয়ার : বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১), বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

হাবিবুল্লাহ, বি.ডি. : শেরে বাংলা, ঢাকা, ১৯৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী সাময়িকী

Ahmed, Sufia	:	Origins of the Dhaka University—The Dhaka University Studies, vol-xxxx, June, 1984.
Das, Ujjwal kanti	:	The Bengal Pact of 1923 and its reactions--Bengal Past and Present, vol. xcix, Part I, January-June, 1980.
Griffin, Ernest, H. (Introduction by)	:	Memories of the Late RT. Hon'ble Syed Ameer Ali- Islamic Culture: The Hydrabad Quarterly Review, 1931-1932.
Subhan, Abdus	:	Nawab Abdul Latif: Father of Musim Awakening in Bengal, Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, vol. 35, June, 1990.
Ali, Muhammad	:	Meeting at Dhaka, 30 December 1906.
Khan, M. S.	:	Birth of Muslim League, Pakistan Observer, 23 March, 1968.
Ahmad, Abul Mansur	:	Sher-e-Bangla and Presents, Pakistan Observer, April 27, 1968.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাময়িকী

মুজিবর রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	মাসিক মোহাম্মদী, ১৩শত বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য, ১৩৪৭।
হক, মুহম্মদ এনামুল	বাঙ্গালী মুসলিম মানসে তুর্কী বিপ্লবের প্রভাব, ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবন, ১৩৭৫, দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
এ. কে. এম. ইদ্রিস আলী	উসমানীয় খিলাফত ও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বত্রিশ বর্ষ, ১ম ৩য় সংখ্যা, ১৪০৫।
মুস্তফা নূরউল ইসলাম	মুসলিম বাংলা সাহিত্য পাঠ পরিক্রমা, প্রথম প্রকাশ, রাজশাহী, ১৯৬৮।
হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার	বঙ্গভঙ্গ রদের প্রক্রিয়া: শাসনতান্ত্রিক বিশ্লেষন, ইতিহাস, ১৩ বর্ষ, ১ম -৩য় সংখ্যা, ১৩৮৬।

ইংরেজী সংবাদপত্র

The Moslem Chronicle, 3 August, 1901.

The Englishman, 20 December, 1906.

The Bengali, 24 December 1906, 1 January 1907, 18 January 1907,10 January 1907, 23 January 1909, 9August 1935, 25April 1916, 24 December 1906, 1 January 1907, 18 January 1907, 10 January 1907, 23 January 1909, 9August 1935, 25April 1916.

Dhaka University Institutional Repository

Millat, 26 April 1946, 2 May 1947, 20 May 1947, 9 June 1947.

Star of India, 22 November, 1937,19 April 1939, 31 October 1939, 2 September 1940, 10 September 1941, 24 April 1943, 10 April 1944, 5 April 1946, 24 April 1946, 16 August 1946, 11 March 1947, 4 April 1947, 27 April 1947, 20 May 1947, 29 May 1947, 3 June 1947.

The Statesman, 24 April 1946, 12 March 1947, 21 April 1947, 3 May 1947, 15 May 1947, 23 May 1947, 5 June 1947, 8 June 1947.

The Hindu, 24 May 1947.

The Morning News, 17 March 1947, 4 May 1947, 16 May 1947.

Azad, 2 January 1938, 20 January 1938, 9 January 1942, 16 March 1947, 1 May 1947, 4 May 1947, 16 May 1947.

The Telegram, 9 December 1941, 12 December 1941, 28 March 1943.

The London Times, 20 January 1907.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সংবাদপত্র

ঢাকা প্রকাশ,৮ জানুয়ারি ১৯০৭, ১০ মার্চ ১৯১২, ৩০ নভেম্বর, ১৯১৯, ১৪ই মার্চ, ১৯২০, ১৪ ডিসেম্বর ১৯২০।

অমৃত বাজার পত্রিকা, ৫ এপ্রিল ১৯৪৭, ৮ এপ্রিল ১৯৪৭।

দাপ্তরিক দলিলপত্র

A Brief Summary of Political Events in the Presidency of Bengal During the Year 1937, Government of India (Home-Political), file 132/38, NA

A Brief Summary of Political Events in the Presidency of Bengal During the Year 1938, Government of India (Home-Political), file 68/40, NAI

Formation of Ministry (1937), Government of Bengal, file R3/2/62, IOLR.

Formation of New Government Under Fazlul Hug (1941-43), 2 parts, fileL/P&J/8/651, IOLR

Franchise: Elections in Bengal 1945-46, file LUP&I13, A.1, IOLR

Government of India Act, 1935 Schedule 6, (London 1935)

Dhaka University Institutional Repository

On Partition (1947), Government of Bengal, file MSS Eur E 341/46, 1OLR.

Transfer of Power Papers, file L/P&/79-80, IOLR

Viceroy’s Correspondence with Governors and Their Secretaries, file RUB/1/1, IOLR

Notes of Private Secretary to Governor (Bengal), file R/3/2/63, IOLR.